নতুন ধারাবাহিক উপন্যাস
ডাউন হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট। সুজিত দাস
নতুন ধারাবাহিক কলম
রাজনগরের রাজনীতি। অরবিন্দ ভট্টাচার্য
এ নদী কেমন নদী। তুহিন শুভ্র মণ্ডল
আসামের চিঠি। সমর দেব
অন্যান্য ধারাবাহিক
ইতিহাস। রেনী-র ডুয়ার্স
উপন্যাস। তাজ্জব মহাভারত
গল্প। মৌসুমী ভৌমিক

উত্তরে বাংলার মুক্ত কণ্ঠ

এখন ডুয়ার্স

মার্চ ২০২০। ২০ টাকা

জল। জঙ্গল। জনসত্তা

গান্ধী ১৫০
গৌতম রায়ের নিবন্ধ।
কার্গিল ফ্রন্টে একা ডুয়ার্স কন্যা
সুতনয়া মিত্র মজুমদারের গৌরবময় স্মৃতিচারণ

নারী বিনা কি বসন্ত আসে পৃথিবীতে?

তবু অপরাধী তার অবাধ্য যৌনাঙ্গ নিয়ে অকুতোভয় ঘুরে বেড়ায় এনকাউন্টারের পরোয়া না করে। গণতন্ত্রের ধ্বজা উড়িয়ে আমরা তার ফাঁসির তারিখ পিছিয়ে দিই বারবার, আমাদের খরচে সে কারাগারে বসে মাংসভাত খায়। নারীত্ব অপমানিত হতে থাকে রোজ ঘরে বাইরে অফিসে আদালতে স্বর্গে নরকে।

সঙ্গে বিনামূল্যে কবিতা এখন ডুয়ার্স নমুনা সংখ্যা

ওহে জীর্ণ পুরাতন! বদলানোর কথা বললেই চটে লাল কেন?

প্রত্যেক সংখ্যায় সম্পাদককে কোনও ভারি বিষয় নিয়ে গুরুগম্ভীর মত বা দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্ত করতে হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা আছে কিনা আমার জানা নেই। সত্যি কথা বলতে সম্পাদক তার কলম থেকে কখনই ছুটি পাবে না এমন কথাও বলা নেই কোথাও। সবটাই আসলে আমাদের মনগড়া তত্ত্ব, কিংবা তত্ত্বের আড়ালে রাখা পুরনো বদ অভ্যেস। তার মধ্যে কোনওটা সত্তর, কোনওটা একশ, এমনকী কোনওটা দেড়শ বছরের পুরনো লালিত। যা আমরা চট করে বদলাতে চাই না বা দিই না। বরং বদলানোর কথা শুনলেই চটে লাল হয়ে যাই।

যেমন ধরুন দিন কয়েক আগে সোশাল মিডিয়ায় শিক্ষিত সচ্ছল বন্ধুদেরকে, সংস্কৃতি ও সাহিত্যপ্রেমী পরিচিতদের উদ্দেশ্য করে বললাম, পুরনো স্লোগান বা গান দিয়ে বা কলম দিয়ে পুরনো স্টাইলে নয়া শতকের 'নিও জেন' অন্যায়ের প্রতিবাদ করে কোনও লাভ নেই ভাই, পদযাত্রা অবরোধ মহামিছিল আগুন ইত্যাদিতে কাজের কাজ কিছু হয় না আর। উল্টে শাসক যখন আগাম সাবধানী হয়ে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেয়, তখন আমাদের সব জারিজুরি শেষ হয়ে যায়, আমরা কলের দম দেওয়া পুতুলের মত স্তব্ধ হয়ে যাই। কারণ আমরা চেতনাসম্পন্ন মানুষেরা আমাদের প্রাণভোমরাটিকে নিজের অজান্তেই কবে সেই দৈত্যের হাতে তুলে দিয়েছি। যাকে আমরা একদিন মহোৎসাহে ছিপি খুলে বোতল থেকে বের করেছিলাম, সমস্বরে বলেছিলাম, উল্লাস। অতএব আজকের দিনটিকে যদি ধরেই নিই ভীষণ দুর্যোগপূর্ণ সময়, তবে অহেতুক চিৎকার চেঁচামেচি করে শত্রুর নজর না কেড়ে মূক হয়ে নীরবে নয়া প্রজন্মকে আড়ালে সচেতন শিক্ষিত করে তোলা যায় কিনা সেই প্রস্তুতি চালানো শ্রেয় নয় কি?

বাস্তবে শিক্ষিতের সঙ্গে অশিক্ষিতদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান রচনার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল সেই বহুকাল আগে! সেসময় শিক্ষিতকে তার শৈশবে সাম্রাজ্যবাদী জুজুর গপ্পো শোনানো হয়েছিল, আর যৌবনে দেখানো হয়েছিল বিপ্লবের ফিলিম। আর অশিক্ষিতকে শেখানো হয়েছিল, যাও তোমাদের হাতে টাকা পয়সা পাসবই এবং বিদ্যাহীন পাশ করার বই সব তুলে দিচ্ছি। তোমরা কেবল ওদের থেকে তফাৎ যাও, উয়াদের কথায় বিলকুল বিশ্বাস কোরো না, উনলোগ আপকা শ্রেণীশত্রু হায়। ওদের যে কোনও উদ্যোগকে জাস্ট ভেস্তে দাও!

দশকের পর দশকের এই মন্ত্রণা প্র্যাকটিস একসময় কাজ দিতে বাধ্য! তা সে শরীর হোক বা মন, কিংবা মনন। সে ব্যবধান বাড়তে বাড়তে সমুদ্র প্রমাণ হয়ে গিয়েছে কবে খেয়ালই করি নি কেউ। আজ অশিক্ষা কবলিত এককালের দুঃস্থ সমাজের হাতে জমছে অজস্র সরকারি ভাতা-র অর্থ, তাতে জনকল্যাণ কতটুকু হচ্ছে তা বোঝার উপায় নেই, তবে সেই সামর্থে বলীয়ান তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি কিনছে, নাগালে পাচ্ছে আন্তর্জাতিক বিলাস তথা লুম্পেনগিরির স্পর্ধা। কৌতুকী অবহেলার চোখে তারা দেখে মুষ্টিমেয় শিক্ষিতকুলের সাবেক কাণ্ডকারখানা। শিক্ষক গায়ক বা সাধক বেধড়ক প্যাঁদানির হাত থেকে রক্ষা পায় না কেউ। বিশ্বায়ন ভোগবাদ বা ডিজিটাল জমানাকে ক্রমাগত দোষারোপ করে যাচ্ছি আমরা, কিন্তু ওদের সঙ্গে আমাদের পারস্পরিক নৈকট্য কবে বিদ্বেষ অবিশ্বাস অবহেলায় পর্যবসিত হয়েছে তার খবর কেউ রাখি নি!

আজ তাই যেসব ম্লান মূক মুখে প্রতিবাদের ভাষা ফোটানোর কথা বলেন বন্ধুরা, সেই মুখগুলি আসলে যোজন যোজন দূরে সরে গেছে। আজকের সাহিত্যে সেসব নতুন চরিত্র নেই তাই নতুন সংঘাত নেই। বইমেলা স্টলে কিংবা কবিতা পাঠে অথবা প্রেক্ষাগৃহের মনোজ্ঞ আলোচনা সভায় পরিচিত বৃত্তের বাইরে ক'টা নতুন মুখ খুঁজে পাই আমরা? ক'টা বই বিক্রি হচ্ছে সেটাই যদি লেখক হওয়ার মাপকাঠি হয় তবে আপনি কি বুকে হাত রেখে বলতে পারেন আপনার সাহিত্যকে কমন ম্যানের কাছে পৌঁছতে গেলে কতগুলি এডিশন পেরিয়ে আসতে হবে?

আর আগামী সুনামিতে যদি একমুঠো খড়কুটোর মত ভেসেই যাই তবে দোষ আর কাকে দেব ভাইসাহেব?

প্রদোষ রঞ্জন সাহা

এখন ডুয়ার্স পত্রিকা প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি, বাটা গলি, হিলকার্ট রোড৯৪৩৪৩২৭৩৪২
শিবমন্দির
অনুপ দাস, শিবমন্দির বাজার ৯৫৬৪৯৯৮৫৬১
জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক, কমার্স কলেজের বিপরীতে ৯৭৩৩২৪৬৯১৩
মালবাজার
সম্রাট (হোম ডেলিভারি) ৯৩৩২০০৫৮৬৫
চালসা
দিলীপ সরকার, চালসা মোড় ৯৭৭৫৪১৫১৪৪
বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল ৯৪৩৪৮০৯৫৯০
বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২
মাদারিহাট
জগৎ চৌধুরী (হোম ডেলিভারি) ৯৩৮২৯৭৭৬২৯
লাটাগুড়ি
সৌমেন (হোম ডেলিভারি) ৯০০২৪০৯৮৯৩
ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮
ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল ৯৪৩৪৪১২৬৪৯
তুফানগঞ্জ
আনন্দবাজার বুক স্টল ৯৩৩৩৬৮৮৬৭১
দিনহাটা
হরিপদ রায় ৯৯৩২৬৩৯০৬৮
আলিপুরদুয়ার
দীপক কুমার হোড়, কলেজ হল্ট ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭
কোচবিহার
জয়ন্ত দাস, বড় পোস্ট অফিসের বিপরীতে ৯৪৩৪২১৭০৮৪
মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি ৭৮৬৪৯৯৫৫১৫
বালুরঘাট
নীলাদ্রিশেখর মুখার্জি ৬২৯৫৯৮৭২৭৮
আসানসোল
পরশ কেশরি ৮৯৬৭১২২০৯৩

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন ৯৮৩০৪১০৮০৮
কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার ৪০৬৪৪০৯৭

এখন ডুয়ার্স-এ লেখা পাঠান হাতে লিখে নয়, টাইপ করে

ডুয়ার্স সংক্রান্ত আপনার কোনও লেখা থাকলে টাইপ করে পাঠান। আপনার লেখা সম্পাদকমণ্ডলীর পছন্দ হলে এই পত্রিকায় তা ছাপা হবে। লেখার বিষয়বস্তুর উপর ছবি থাকলে অবশ্যই পাঠাবেন।

মেল করতে পারেন নিচের মেল আইডি-তে editor.ekhonduars@yahoo.com

এখন ডুয়ার্স

ষষ্ঠ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, মার্চ ২০২০

সম্পাদনা ও প্রকাশনা
প্রদোষ রঞ্জন সাহা

সাহিত্য বিভাগ সম্পাদনা
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদনা
শ্বেতা সরখেল

অলংকরণ
শান্তনু সরকার

সার্কুলেশন
দেবজ্যোতি কর
দিলীপ বড়ুয়া

মুদ্রণ অ্যালবাট্রস

ইমেল
ekhonduars@yahoo.com

প্রচ্ছদ গৌতমেন্দু রায়

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে। এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

এই সংখ্যায় যা আছে

সম্পাদকের চিঠি ২

ধারাবাহিক প্রতিবেদন
সার্জেন রেনী'র ডুয়ার্স যুদ্ধের ডায়েরি ৬

গান্ধী ১৫০। খোলা মনে
সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে মতান্তরে গান্ধীজীকে কতটা দায়ী করা যায়? ১০

আসামের চিঠি
বড়ো শান্তি চুক্তি কতটা শান্তি বয়ে আনবে তা সময়ই বলবে ১৩

অ্যালবাম
অভিনয় নিয়ে দুটি বই প্রকাশ ১৫

রাজনগরের রাজনীতি
ষাটের দশক ছিল কমল গুহ তথা ফরওয়ার্ড ব্লকের উত্থানকাল১৬

এ নদী কেমন নদী
মালদা জেলায় নদীগুলি নিয়ে চেতনা আসবে কবে? ১৮

পর্যটন
বউ সাথে পথে পথে ২০

শ্রীমতি ডুয়ার্স
কার্গিল যুদ্ধ ফ্রন্টে একা বাঙালি কন্যা ছিলেন ডুয়ার্সের সুতনয়া ২৩
কেশিনীর কথা ৩৮

ধারাবাহিক উপন্যাস
ডাউন হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট ২৬

ধারাবাহিক কাহিনি
তাজ্জব মহাভারত ৩০

গল্প
অপারেশন অশরীরী ৩৪

উত্তরের উপকথা
তরাই বনের কিংবদন্তী ৩৬

কবির কলমে
মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস ৩৭

নিয়মিত বিভাগ
ফেসবুক পোস্ট ৪
খুচরো ডুয়ার্স ৫
রাসায়নিক রস ৩৯

শৌভিক কুন্ডা

ফেব্রুয়ারি ৮

টিফিন। শব্দটা কিছুটা পিছিয়ে থাকা অঞ্চলে, আর স্কুলস্তরে এখনো চালু আছে। আধুনিক স্কুলগুলো যদিও আজকাল বলে "রিসেস"। আমাদের ছোট বেলায়, ব্রেকফাস্টেরও টিফিন নাম ছিলো, ইভনিং স্ন্যাক্স এন্ড টী এরও তাই। স্কুলের মাঝে বিরতিতে টিফিন, অফিসবাবু যাঁরা, তাদেরও ছিলো "টিফিন আওয়ার"। শেষ উদাহরণটি বোধহয় এখনো স্ব-মহিমায় আছে। শহর ছাড়িয়ে লক্ষ্মী পাড়া অঞ্চলে এক বিয়ে বাড়িতে গিয়ে, বছর চারেক আগেও, বরযাত্রীদের আগে "টিফিনের প্যাকেট" দেওয়ার নির্দেশ নিজের কানে শোনা, ঘড়ি বলেছিল তখন রাত আটটা! এমনকি, ঐ রকমই আর এক জায়গায়, সিঙ্গল মল্ট হুইস্কি সহযোগে ডিনার পার্টিতে (আহ্বায়কের জবানিতে, দামি দারুর ব্যবস্থা) স্টার্টার, চাট বা চাখনা যাই বল, তাকেও "টিপিন" বলতে শুনেছি গৃহস্বামীকে!

মোদ্দা কথায়, এই আধুনিকতার সময়ে হাতে গোনা হলেও কিছু ক্ষেত্রে, আর আমার ছোটবেলার সেই আদিম যুগে, দুপুর আর রাতের ভাত বাদ দিলে, বাকি সবসময়ের খাবারই ছিলো "টিপিন"! এ প্রসঙ্গে আর একটা চলন মনে এলো, সে সময় বিয়ে বৌভাতে "টী-পারটি" বলে একরকম ব্যাপার চালু ছিলো, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কাগজের প্লেটে গোটাকয়েক মিষ্টির (রসগোল্লা, সন্দেশ অবশ্যই, অন্য প্রকারেরও কিছু) সাথে একরকম ঝাল/নোনতা (চপ বা কাটলেট বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, দু'এক বার মোগলাই পরোটাও পেয়েছি)! তো, নাম টী-পারটি হলেও সেসব নিমন্ত্রণে আমি চা বস্তুটি কক্ষনো দেখি নি!

টিফিন শব্দটা প্রথম আমি শুনি শিশুনিকেতনে ভর্তি হওয়ার পর। তার আগে বাড়িতে সকালের খাবার আর বিকেলের খাবার নামেই জেনে এসেছিলাম। তো ঐ কচি বয়সের স্কুলে "টিফিন" খুব উত্তেজনার ছিলো। আইটেমের কথায় পরে আসছি, উত্তেজনার প্রাথমিক কারণ কিন্তু ছিলো যে আধারে তা পরিবেশন করা হত, সেই পাত্রটি। প্রত্যেক ছাত্র/ছাত্রীর আলাদা আলাদা চীনেমাটির বাটি, নানা রঙের। কেউ যদি নৌকোবাটি পেয়ে গেল, সেদিন সে বাদবাকিদের হিংসার আঁচ পেত। সে টিফিনও ছিলো এক একদিন এক এক রকম। কোনো দিন পায়েস, কোনো দিন একটুকরো মাংস আর এক টুকরো আলু ডোবানো স্ট্যু, জেলি-পাঁউরুটি, ফ্রেঞ্চ টোস্ট। "ফিসফাস"! ওঃ সে অমৃত ভোগ এখনো কি কেউ তৈরী করেন! আর ছিলো সন্দেশ। না, রেগুলার কোর্সের টিফিন নয়, কারো যদি পেটখারাপ হত, তবে সেদিনের টিফিন যা কিছুই হোক না কেন, রোগীটির জন্য সন্দেশই বরাদ্দ থাকতো। সুমন যতই বলুন 'অসুখ বিসুখ হওয়ার "পরে" জিলিপি সন্দেশ!' পেটখারাপের কথা প্রথম পিরিয়ডেই জানিয়ে দিতে হত! সায়লিদিদি/মায়লিদিদির কাছ থেকে যদি ঘূ নাক্ষরেও জানা যেত অপছন্দের কোনো টিফিনের নাম, সেদিন অনেকেরই 'পেটখারাপ' হয়ে যেত!

অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়

ফেব্রুয়ারি ২৯

বিমর্ষ চাঁদের গান

বুক ফেটে কান্না বেরহচ্ছে। কেনো কেনো জিজ্ঞেস করেও কোনো উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পাচ্ছি সাতরঙা রামধনুর মাঝে একটি মেয়ে দুহাতে দুটো খুলি নিয়ে উড়ে যাচ্ছে। উড়ে যাচ্ছে আকাশ-বাতাস-পৃথিবী-সমুদ্র-নদ-নদী পেরিয়ে তোমার আমার ঘরের চালের ওপর দিয়ে সজোড়ে আওয়াজ করে উড়ে যাচ্ছে। এ আওয়াজের কোনো পেট্রোল গন্ধ নেই। উড়তে চাওয়ার প্রবল ইচ্ছা আমাদের উড়ন্ত করে দেয় এই স্বপ্নে আমরা কখনোই বিশ্বাস করিনি। ফিরে আসা ভোরে পরে থাকে টুকরো টুকরো পাথর। সেই পাথর দিয়েই মাথা থেতলে দেওয়া হয়েছে কত পথিকের। আর প্রতিবার আরও আরও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়েছে পাথরেরা। যে মাথাগুলো থেতলে দেওয়া হলো তাদের ইতিহাস আমরা কেউ জানিনা। পাথরের গায়ের রক্তেরদাগ দাগ এবং তার ক্ষয়প্রাপ্তির পরিমান দেখে জড়িয়ে ধরি একে অপরকে। বলি গ্রাম মাটি সভ্যতা এর কোনোটাই আমরা নই। আমরা তারও উঁচু আমরা আরও উঁচু এই বোলতে বোলতেই মাথার উপর দিয়ে দুই হাতে দুটো জ্বলন্ত খুলি নিয়ে উড়ে যায় সেই মেয়ে। আমাদের চৌহদ্দির কোনো হিসেব থাকে না। যা কিছু অদম্য চাওয়া তার কোনোটাই ফিরে আসে না। মুঠো খুলে উড়ে যায় সব ওই মেয়েটার সাথে। একে অন্যের খোলোস যতটা মুগ্ধতা সঞ্চার করে তাই দিয়েই জুড়াই নিজেদের। আলগোছে কানে ফুলগুজি রক্ত উগরিয়ে ফুল ঝলসে দেয় মুখের একপাশ। আর একপাশ দিয়ে অবিরাম ঝরে জল। বুকফাটা কান্না। ঝলসানো স্থানে ফুটে ওঠে কোটি কোটি তারা, আমার আর মহাবিশ্বের এই অসীম সীমানা—

ভয় হয় তবু বড়ো ভয় হয় মনে, মৃত পথিক, ঝাউগাছ, নদীর ঘাটেদের কথা মনে পরে। এককালে আনাচে কানাচ ছিলো, ছিলো অনেক অনেক ফিসফিসে হাওয়া আজ তার শেষটুকু বাজারেও মেলে না। রক্ত উগরানো ফুল আর জ্বলন্ত মাথার খুলিতে ভরে যায় সব তোমার আমার দেহ, মন, স্বপ্ন, আনন্দ, বিষন্নতা, শৈশব।

অনিমেষ বৈশ্য

মার্চ ১

একজন সাংসদ বলছেন, গোলি মারো সালোকো। তা-ও শান্তি মিছিলে। "সালো"টা কে? যা বোঝার বুঝুন। না-বোঝার কথা নয়।

দেশটা যেন গব্বর সিংয়ের ডেরা। খৈনি ডলছে। গুলি ছুড়ছে। মশা-মাছির মতো দেহ পড়ছে। গাধা না ঘোড়া কার পিঠে যেন চড়ে মৃতদেহ যাচ্ছে। তৃতীয় সুর, ষষ্ঠ সুর, মরা চলে বহু দূর।

কিছুদিন আগে এক যুবক পুলিশের কানের কাছে পিস্তল ধরে ছিল। শোনা গেল, সে গ্রেপ্তার হয়েছে। তার পর শোনা গেল, সে গ্রেপ্তার হয়নি। তা হলে সে গেল কই? তার বাড়িতেও নাকি কেউ নেই। কাল শান্তি মিছিলে ছিল না তো? কে জানে? প্রথমে জানা গেল, ছেলেটার নাম শাহরুখ। নাম শোনামাত্র স্বস্তি! শালা মোচলমান। না হলে কি হাতে পিস্তল থাকে! তার পর শোনা গেল, ওর নাম চন্দ্রাল শুক্লা।

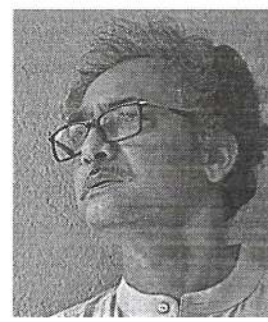

আবার স্বস্তি। যাক মোচলমান নয়। যত দোষ মোচলমানের! আজ শুনলাম, ছেলেটির বাবা আগে হিন্দু ছিল। পরে ইসলাম ধর্ম নিয়েছে। ধর্মের খানাতল্লাশি চলছে। কিন্তু ছেলেটার খোঁজ নেই। সে শাহরুখ না চন্দ্রাল তা নিয়ে তুমুল টেনশন। সারা দেশ জানতে চায়, ও হিন্দু না মুসলিম? তার পর শুরু হবে বিজয় উল্লাস। হিন্দু বলবে, "দেখেছ, শালা মোচলমান। গোলি মারো সালোকো।" মুসলিম বলবে, "দেখেছ মুসলমানের নাম নিয়ে হিন্দুরাই গুলি ছুড়েছে।" ছেলেটার কী হবে খোঁজ নেই। ফাঁসি না দ্বীপান্তর খোঁজ নেই। ওর ধর্ম তো জানা হয়ে গেছে। চলো, তা নিয়ে শুরু হোক আর এক প্রস্ত হানাহানি। কিন্তু "কেন এই হিংসা-দ্বেষ, কেন এই ছদ্মবেশ?"

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের একটা গল্প পড়েছিলাম। "একটা পিস্তল ও ডুমুর গাছ।" সেই গল্পে একটা ছেলে ছিল। তার নাম বোকা। তাকে জিজ্ঞেস করেছিরু, "তোর গামছায় কী?" বোকা বলে, "ক্ষু্দ্র পিস্তল। টার্গেট প্র্যাক্টিস করতে যাচ্ছি। ঘাটের মাথায় ডুমুরগাছটা দেখছ, ওখানে।" তারপর বৃদ্ধ ডুমুর হাসে। আর বোকা গুলি ছোড়ে। গাছেদের স্বভাবই এই। ছায়া দেয়, ফল দেয়, বুক পেতে টার্গেট হয়। তারপর বোকা একদিন নিজেই "ফনিশ" হয়। তারপর?

গাছের গায়ে অসংখ্য গুলির চিহ্ন। আর সে চিহ্নগুলো ক্রমশ চোখ হয়ে যাচ্ছে।

গাছটা কে, লেখক বলেননি। চোখটা কার লেখক বলেননি। সব বললে গল্প হয় না। লেখক বেঁচে থাকলে ঠিক জিজ্ঞেস করতাম, "বুড়ো গাছটা কে, ওই ভেজা চোখের মতো গুলির ক্ষতচিহ্ন কার?"

সিরাজ হয়তো এখন বলতেন, "ভারতবর্ষ। ছায়া দেয়, ফল দেয়, আবার টার্গেটও হয়।"

অনেক ভাবা প্র্যাক্টিস হল। এ বার চলুন টার্গেট প্র্যাক্টিস করি। গোলি মারো সালোকো।

খুচরো ডুয়ার্স

বসন্তে পিকে ধায় দিকে দিকে, কী কী দেয় লিখে? নেতা নেয় শিখে।

হায়! বাঙলায় পিকে ব্যানার্জির পর আরেক পিকে আসিয়া দলরূপী ধনেখালি পিকো করিতেছে। বৈকুণ্ঠপুরের কানাইয়া কুমার ব্লকাধিপতিদের রাতারাতি ব্লক মারিয়াছেন। উহারা নাকি সব ব্লকধার্মিক। সম্পাদকের পরামর্শে রোজ ভোর ন-টায় উঠিয়া বেশর্করা কৃষ্ণকফি পান করতঃ পাঁচখানি সংবাদপত্র পড়িতেছি। ডুয়ার্স জুড়িয়া পিকেভয় অব্যাহত। সামনেই মুন্সিপালিটি নির্বাচন। ছোটফুলের ঘুমন্ত, বিমর্ষ, অবহেলিত পুরাতন কুঁড়িগুলিকে ভোটার তালিকা মিলাইয়া খুঁজিয়া ফুটাইবার ব্যবস্থা চলিতেছে। বড়ফুলেরও এক দশা। সেমসাইড গোল লইয়া দুই ফুল বসন্তে সরিষা ফুল দেখিতেছে। বড়ফুলের পিকে নাই। থাকিলে পিকেতে পিকেতে মারপিট লাগিত। এই কারণেই কবিবর পুরন্দর ভাট লিখিয়াছিলেন—

ঘরেতে পিকে এল গুণগুণিয়ে
কার নাম বাতিল হবে যায় শুনিয়ে।

ডেঙ্গি আলা রে

শিলিগুড়িতে বসন্ত আসিয়াছে। ইহা নতুন কথা নহে। শিলিগুড়িতে দেবানামপিয় এখনো ব্যাটিং করিতেছে। ইহা কোন—। শিলিগুড়িতে ডেঙ্গি আসিয়াছে। ইহা—। দাঁড়াও বাপু! নতুন কতা নয় জকন বলচো তকন চ্যানেলে-কাগজে এত হাহাকার কেন বাপু? বসন্ত এসে গ্যাচে মানে তো ডেঙ্গিও এসে গ্যাচে। এদিকে চা বাগানের নাম 'ডেঙ্গয়াঝাড়' আচে তা জানো নি? একদম ঠিক কথা কহিয়াছো! কাগজে লিখিয়াছে, শিলিগুড়ি মশকের আঁতুরঘর! যেন দিদির আমলে মশা প্রথম শিলিগুড়িতে আসিয়াছে আর দাদার প্ররোচনায় জন্মাইতেছে! মশার জ্বালায় নাকি দোকানে বসিয়া চা-পান করা অসম্ভব! বাজে কথাই বটে? অতীতে কোন বসন্তে এমন চা-পান হইত না? কথা হইল বসন্ত আসিলে মশক আসিবে ইহা প্রকৃতির নীতি এবং মশক আসিলে গম্মেন্টের লোক আসিবে না ইহা সরকারের দ্রব্যগুণ। কী কহিলে? জ্যোতি-বুদ্ধর আমলে মশা আসিত না? লাস্ট মশা আসিয়াছিল সিদ্ধার্থ রায়ের যুগে? তাহার পর আবার দিদির কালে? তাই কহ! সেই কারণেই লিখিয়াছে।

পথই রাস্তা

কথা হইয়াছিল বাস স্ট্যান্ড হইতে বড়ুয়াপাড়া অবধি চকচকে রাস্তা হইবে। তথায় রাফেল না নামিতে পারিলেও চতুর্চক্র যান ফাটাইয়া চলিবে। ঠিক যে রূপ রাস্তা পাইলে অর্বাচীন খোকারা আত্মহত্যা করিবে বলিয়া বাইক দৌড় করায় ঠিক তেমন। শুনিয়া পাব্লিক ভাবিল, যাক! ক্ষেতরাস্তা (রাস্তারূপী ক্ষেত) পার হইয়া বাসে উঠিতে হইবে না। বর্ষাকালে এক পাটি জুতা কাদায় হারাইয়া স্ট্যান্ডে আসিতে হইবে না। কত্ত সুবিধা। তাহার পর একদিন রাস্তা শুরু হইল। ধাঁই ধাঁই করিয়া ফিফটি পার্সেন্ট শেষ। তাহার পর ঠিকাদার কহিলেন, সাতদিন রেস্ট। তারপর বাকিটা ফটাফট। শুনিয়া সাড়া পড়িয়া গেল। শ্বশুর লিখিলেন, বাবাজীবন! এ মাসে না আসিয়া সামনের মাসে আসিও। যৌতুকের বাইক চালাইয়াই চলিয়া আসিতে পারিবে। কেহ গাড়ি-বাইক কিনিবে বলিয়া ঘন ঘন শোরুমে যাইতে লাগিল। এইভাবে সাতদিন গেল, সাত সপ্তাহ গেল, সাত মাস গেল— সেই ঠিকাদার আর ফিরিয়া আসিল না। তখন খোঁজ লইয়া জানা গেল আরিব্বাস! যা যা করিবে কহিয়াছিল কিছুই করে নাই। যাহা করিয়াছে তাহা ভাঙিয়া যাইতেছে। ক্রমে রাস্তা আবার পথ হইয়া গেল। আবার জুতা হারাইতে লাগিল। আবার—। না। দুই বছর হইতে চলিল। দ্যাট ভেরি বয় দ্যাট ভেরি ডে গন গনা গন নেভার রিটার্ন। তাহার পর কী হইল জানিতে মন্ডলঘাট যাইতে পারেন।

ভেজ চিতা

চিতা এখনো নিরামিশাষি হয় নাই। চিতা যদি ঘাস খায় তবে ঘাস যারা খায় তাদের খাবে কে? তাই গেরস্ত যদি বলে চিতার হানায় আমার ক্ষেতের বেগুন লুপ্ত হইয়াছে কিংবা চিতা আসায় দুই বিঘা ধানের বারোটা বাজিয়াছে, তাহা হইলে গম্মেন্ট বিশ্বাস করিবে না (করিলেও গেরস্তকে প্রচুর খর্চা করিতে হইবে) এবং সেহেতু গম্মেন্ট ক্ষতিপূরণ দিবে না। বিপরীতে, গেরস্ত যদি বলে, হাতি আসিয়া আমার মুরগি-ছাগল খাইতেছে, তাহা হইলেও ক্ষতিপূরণের আশা নাই। ইহা প্রকৃতির নিয়ম। হাতি যদি গরু খাইত তবে জঙ্গলে দাঙ্গা লাগিত। এইরূপ নিয়ম থাকিবার পরেও গেরস্ত যখন কহিল চিতার হানায় আমার দুই বিঘা ধান কৈশোরেই

পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে তখন গম্মেন্ট ভাবিয়া কূল পাইল না। গুগল ঘাঁটিয়া নিরামিষ বুনো বাঘার ইনফো মিলিল না। বিশেষজ্ঞরা টেক্সট করিয়া জানাইল, ইহা আনপসেবল! তাহা হইলে কি গেরস্ত ঢপ দিতেছে? এইরূপ কাঁচা ঢপ আজকাল কেহ দেয়? তখন তদন্ত করিয়া জানা গেল গেরস্ত সত্য কহিতেছে। চিতার হানায় দুই বিঘা ধান আর কোনওদিন চালের মুখ দেখিবে না। হাতি যেরূপে তছনছ করে সেরূপেই ক্ষেতের ধান্য তছনছিত। কারণ? চাপ লইবেন না। চিতা হানা দিয়াছিল। চিতা ধরিতে বারোজন আসিয়াছিল। ধরা দেখিতে আসিয়াছিল দ্বি শতাধিক এবং তাঁহারা সবাই ক্ষেতের উপর দিয়া আসিয়াছিল।

ফলে আবার প্রমাণ হইল চিতা ভেজ নন, ননভেজ।

পাঠকপত্র

(কোনও কোনও পাঠক ভুল করিয়া আমাকে সম্পাদক ভাবিয়া পত্রিকায় ছাপিবার জন্য পত্রাদি পাঠাইয়া থাকেন। দু-একটি ছাপিতে দিলাম। পত্রলেখকদের নাম দিলাম না। তাঁহারাও চান না।)

১) হলদিবাড়ি ইস্টিশানে চমৎকার হিসুমহল আছে শুনিয়া ট্রেনে চাপিয়া দেখিতে গিয়াছিলাম। সঙ্গে সমিতির কয়েকজন সদস্য আছিল। তাঁহারা সকলেই হিসু চাপিয়া ট্রেনে উঠিয়াছি। পরামর্শ আমিই দিয়াছিলাম। হলদিবাড়িতে ট্রেন থামিতে সবাই ছুটিলাম। গিয়া দেখিলাম তালা। হিসুমহল নাকি তালাবন্ধ রাখিবার নিয়ম। চাবি কোথায় কেহ জানে না। তখন আমরা অতি কষ্টে হিসু চাপিয়া পরের ট্রেন ধরিয়া নিজের ইস্টিশানে আসিয়া হিসু করিয়া মুক্তি পাই। নমস্কারান্তে। ইতি কখগ।

২) মহাশয়, আমার শ্বশুরালয় কোচরাজ্যে। পাঁচ বছর হৈল জামাইষষ্ঠী করিতে যাই। সন্ধ্যার পর শ্যালিকার সহিত পদচারণা করি। শুনিলাম ভোটের আগে পুরসভা ওয়ার্ড পিছু তিরিশ খানি করিয়া এলইডি লাগাইবে বলিয়া ঠিক করিয়াছে। ইহা আমি বিবাহের পর হৈতে শ্বশ্রুমাতার মুখে শুনিয়া আসিতেছি। কোচরাজ্যে পুরসভায় পুরপতির স্ট্যাচু থাকে। উহারা খুব কাজের লোক হৈয়া থাকেন। ভাবিতেছি পাঁচ বছরের কাজ এক বছরে করিতে গিয়া যদি অনুপ্রেরণার আতিশয্যে ৩০ গুণ ৫ ইজুকাল্টু ১৫০টি এলইডি ওয়ার্ড পিছু লাগাইয়া ফেলেন তবে শ্যালিকার সহিত ঘুরিতে সমস্যায় পড়িব। কারণ অতিরিক্ত আলোকে আমার মাথায় যন্ত্রণা হয়। শুনিয়াছি আপনার সহিত পুরসভার জানাশুনা আছে। দয়া করিয়া দেখিবেন যাহাতে আতিশয্য না হয়। আমি ভাল আছি। কাটমানির টাকা কিছু হৈলেও ফিরৎ পাইয়াছি। প্রণাম নিবেন। ইতি চছজ।

৩) মহাশয়, জলপাইগুড়ির ঠিকানা দেখিয়া মনে হইল আপনারা সমস্যাখানি বুঝিবেন। বিষয় হইল, আমাদিগের শহরে একখানি সেতু স্থানীয় পুরসভা ভাঙিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার পর বানাইতে পারে নাই। সেতুটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। সেতু না থাকায় অনেকেরই টোটো ভাড়া দিতে ফাটিতেছে, বরানগর হইতে হাওড়া ব্রিজ হইয়া বইমেলা যাইতে হইবার মত কষ্ট হইতেছে। ইহাদের মধ্যে তৃণমূলের ভাইবোনেরাও আছেন। একখানি পদসেতু বানাইয়া দিলেও না হয় চলিত, কিন্তু হয় টাকা নাই নয় খাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু আমি আর পাঁচ জনের ন্যায় ভাবি না। আমার ধারণা পুরসভার অনুপ্রেরণার অভাব হইয়াছে। আমি দীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর গণিতের অধ্যাপনা করিতেছি। আমি জানি অনুপ্রেরণা সসীম বিষয়। গোষ্ঠি বাড়িলে পরিমাণে কমে। মহাশয়, আপনাদের পত্রের মাধ্যমে আমি সকলে অনুরোধ করিতেছি কোথাও অতিরিক্ত অনুপ্রেরণা পাইলে এদিকে পাঠাইয়া সেতুকর্ম সম্পাদনে সহায়তা করিবেন। আর পারিতেছি না। ইহার পর গালি দিব। ইতি হযব।

কলম সিং

ধারাবাহিক প্রতিবেদন। চতুর্থ অধ্যায়। ১ম ভাগ

সার্জন রেনী'র 'ডুয়ার্স যুদ্ধের ডায়েরি'

ইঙ্গ-ভুটান যুদ্ধের ঐতিহাসিক লিপি

উমেশ শর্মা

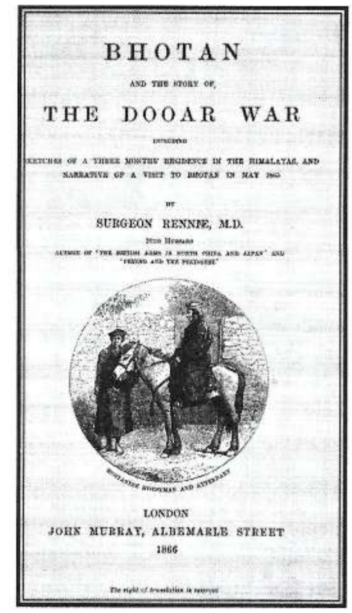

BHOTAN

AND THE STORY OF

THE DOOAR WAR

INCLUDING

SKETCHES OF A THREE MONTHS' RESIDENCE IN THE HIMALAYAS, AND NARRATIVE OF A VISIT TO BHOTAN IN MAY 1865

BY

SURGEON RENNIE, M.D.

AUTHOR OF 'THE BRITISH ARMS IN NORTH CHINA AND JAPAN' AND 'PEKING AND THE PEKINGESE'

LONDON

JOHN MURRAY, ALBEMARLE STREET

1866

The right of translation is reserved

জলপাইগুড়ি থেকে ডালিমকোট:

১৮৬৪ সালের নভেম্বরের শেষদিকে যুদ্ধের সৈন্য সমাবেশ সম্পন্ন হল। চারটি সৈন্যব্যূহ একই সঙ্গে চতুর্মুখী আক্রমণ চালানোর সিদ্ধান্ত হলেও দক্ষিণের সৈন্যব্যূহকে একটু থামিয়ে রাখা হল, এগিয়ে চলল মধ্যভাগের সৈন্যব্যূহ। যানবাহনের কিছুটা সমস্যা হওয়ায় এ ব্যবস্থা। নেতৃত্বে এলেন কর্নেল রিচার্ডসন।

বাঁয়ে ডুয়ার্সে তখন দুই কলাম সেনা। একদল জলপাইগুড়িতে এবং অন্য কলাম কোচবিহারে। বাঁ কলামের নেতৃত্বে বিগ্রেডিয়ার ডান্সফোর্ড এবং বাম-মধ্য কলামের নেতৃত্বে কর্নেল ওয়াটসন।

২৮শে নভেম্বর মেজর গঘ ও মেজর পুঘের নেতৃত্বে একটি বাহিনী জলপাইগুড়ি শহরের তিস্তা নদী অতিক্রম করে বাঁকালিতে পৌঁছালো। এরই কাছাকাছি ভুটানের সীমান্ত দুর্গ ছিল গোপালগঞ্জ। সেখানে কোনও প্রতিরোধ ঘটল না।

পরের দিন সকালবেলা সেনাবাহিনী ময়নাগুড়ি অভিমুখে অভিযান চালায়। সেখানকার ভুটানি সেনাবাস শূন্য। গ্রামবাসীদের জানিয়ে ময়নাগুড়ির দখল নিল ব্রিটিশ সরকার। ৩০শে নভেম্বর মেজর গঘ দোমহনী অভিমুখে ঘুরপথে রওনা দিলেন। দোমহনীতে ধরলা নদীর তীরে একটা ছোট সেনা ছাউনি ছিল। সেটি দু'দিন আগেই ভুটানি সেনারা ছেড়ে চলে গিয়েছিল। দোমহনী দখলে এল।

১লা ডিসেম্বর জলপাইগুড়ি থেকে ৬ মাইল দূরে পাহাড়পুরে যাবার জন্য তিস্তা নদী অতিক্রম করা হল। দোমহনী একদম বিপরীতে পাহাড়পুর। বিগ্রেডিয়ার ডান্সফোর্ড জলপাইগুড়ি থেকে এগিয়ে এসে সেখানে পৌঁছেছিলেন। তিনি আবার তিস্তা নদী পেরিয়ে দোমহনীতে একটা রাত কাটিয়ে কিছু রসদ সংগ্রহ করেছিলেন।

৩রা ডিসেম্বর তিন ঘণ্টা হেঁটে ঘাস ও ঘন জঙ্গল পেরিয়ে দোমহনী থেকে আট মাইল দূরে ক্রান্তিতে পৌঁছায় সেনাদল। ধান, সর্ষে, তামাক ও পাট খেতগুলো ক্রান্তির মনোরম আকর্ষণ।

৪ঠা ডিসেম্বর সৈন্যবাহিনী ক্রান্তি থেকে কয়েকমাইল এগিয়ে ঘন জঙ্গলে প্রবেশ করেছিল এবং বনপথে প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা পেরিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে এসে পৌঁছেছিল। সেখানে চেল নদীর তীরে সেদিনের শিবির স্থাপন করা হয়েছিল। সেখান থেকে ডালিমকোট যাবার রাস্তা, কাছেই।

৫ তারিখে দেখা গেল ওই জনপদ অশ্বারোহী সৈন্যদের পক্ষে অনুপযুক্ত। তাই একাংশকে ফিরিয়ে দিয়ে গোলন্দাজ বাহিনী, মর্টার বাহিনী, পাঞ্জাবি পদাতিক বাহিনী এবং ১৮নং দেশিয় পদাতিক বাহিনী নিয়ে পাহাড়ের উপরে উঠে অম্বইক উপত্যকার দিকে যাত্রা করা হয়েছিল। প্রায় চার ঘণ্টা ফাঁকা জঙ্গলের চওড়া পথ ধরে এগোতে থাকে সবাই। মালপত্র ও বন্দুক নিয়ে বলদের গাড়িতে ও হাতির পিঠে চলল কেউ কেউ।

অম্বইক গ্রামে ৬/৭টার বেশি কুড়ে ঘর ছিল না সেই সময়। ঘন জঙ্গলে পাহাড়ি জনপদ সেটি। এর অবস্থান ডালিমকোটের একদম নিচে। একজন পুরুষ একদল মহিলা বাদে সব বাড়ির লোকজনই ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

অম্বইক দুর্গে পৌঁছে একজন দেশিয় লোকের হাত দিয়ে সেখানকার জুঙপেনকে খবর পাঠানো হয়েছিল। তিনি একজন বাঙালি দোভাষীকে পাঠিয়েছিলেন। লোকটির গলায় বন্ধুত্বের প্রতীক সাদা রুমাল। লোকটির মাধ্যমে খবর পাঠানো হল জুঙপেনকে। তাঁকে বলা হয়েছিল, ব্রিটিশ বাহিনী আজই সরকারের ঘোষণা মত ডালিমকোট ও ডুয়ার্সের দখল নেবে। যদি দুর্গের অধিকার ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে কোনও রক্তপাত ঘটবে না। জুঙপেনকে নিচে নেমে আসতে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। বলা হয়েছিল পরের দিন সকালবেলা দুর্গের দখল নেওয়া হবে।

ইতিমধ্যে দেখা গেল কিছু লোকজন অত্যন্ত দ্রুততার সাথে প্রতিরোধের জন্য তৈরি হচ্ছে। পরের দিন সকালবেলা একটা ছোট ছেলে জুঙপেনের লেখা একটি ছলনাপূর্ণ চিঠি নিয়ে আসে। কর্নেল হটনের চিঠির জবাবে ছিল ওই পত্রটি। চিঠির বিষয়বস্তু নিম্নরূপ—

'ভারত সরকারের ঘোষণাপত্র সম্বলিত আপনার চিঠি আমি ৫ই ডিসেম্বর সোমবার পেয়েছি। আমি চিঠির বিষয়বস্তু নিবিড় মনসংযোগ সহকারে পাঠ করেছি। আপনি আজকে সকালবেলা আপনার ওখানে যেতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু, আপনার সঙ্গে তো বিশাল সৈন্যবাহিনী আছে। তাই আমি কীভাবে ওদের মাঝখান দিয়ে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করি? আমার মনে তো দারুণ ভীতি দেখা দিয়েছে। আপনি যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে এতই ইচ্ছুক, তাহলে সঙ্গে তিনজন লোক নিয়ে বড় রাস্তায় আসুন না! আমিও তিনজন লোক নিয়ে সেখানে যাব এবং আপনার সঙ্গে দেখা করব। সেখানেই আমি সবকিছু জানতে পারব। তাহলে তো সবকিছুই সন্তোষজনকভাবে মিটে যায়।

নতুবা, আপনি দার্জিলিং-এ ছেবু লামাকেও চিঠি লিখতে পারেন এবং তাঁকে এখানে আসতে অনুরোধ করতে পারেন। তিনি তো সবকিছুই জানেন। আমি তাহলে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে পারব এবং সবকিছুই আপনাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলতে পারব। তাহলে সব দিক থেকেই ভাল হয়। আমি কোনওভাবেই আপনার বিপক্ষে নই। আমি সবকিছুই আপনার সাথে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলতে আগ্রহী। আপনি তো এখানে আসার চেষ্টা, সেটা ভাল কি মন্দ জানি না, এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন। আপনি চাইলে তা করতেই পারেন। আমি ভাল আছি। আশা করি, আপনিও কুশলে আছেন।'

ওই চিঠিটির একটি প্রত্যুত্তর দেওয়া হল। জুঙপেনকে জানিয়ে দেওয়া হল যে, সেদিন সকালেই ডালিমকোট দুর্গের দখল নেওয়া হবে। পত্রবাহককে চিঠি দেবার সঙ্গে সঙ্গে সেনারা অম্বইক থেকে ডালিমকোট অভিমুখে যাত্রা করেছিল। একজন দেশিয় লোককে টাকা দিয়ে পথ দেখানোর কাজে নিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু যে পথ দিয়ে সৈন্যরা যাচ্ছিল, ওই পথ অপেক্ষা আরও একটি সহজ পথের সন্ধান পাওয়ায় সেনাদলকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে পুনরায় অভিযান শুরু করা হয়েছিল। অবশ্য এতে ঘণ্টা দুয়েক সময় নষ্ট হয়েছিল। কর্নেল হটন, জেনারেল ডান্সফোর্ড, ক্যাপ্টেন (ব্রিগেডিয়ার মেজর) ম্যাকগ্রেগর, লেফটেনান্ট ল্যাম্যান, লে. অ্যান্ডরসন, মেজর গ্রিফীন, লে. ওয়ালার, লে. কলিন্স বিভিন্ন বাহিনীর নেতৃত্বে থাকলেন। যুদ্ধ শুরু হল।

প্রতিরোধে এগিয়ে এল ভুটানি সৈন্যরা। পাথর ছুঁড়ে, তির-ধনুক ও বারুদের বন্দুক দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুললো তারা। অপর দিকে বন্দুক, আট ইঞ্চি

মর্টার, পাথর ছোঁড়ার যন্ত্র দিয়ে আক্রমণ। দু'জন সৈন্য মারা গেলেন। আহত হলেন কয়েকজন। বারুদের পিপে এনে গোলন্দাজ বাহিনী প্রস্তুত। একটা মর্টারের আঘাতে একটা বারুদের পিপেতে এসে পড়ায় সেটি প্রচণ্ড শব্দে ফেটে যায়। মেজর গ্রিফীন, লেঃ অ্যান্ডরসন ও লেঃ ওয়ালার প্রাণে বেঁচে গেলেও চারজন সৈন্য সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। বিগ্রেডিয়ার জেনারেল ডান্সফোর্ডও অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন।

অশ্বইক থেকে বন্দুকধারী সেনাদের নিয়ে আসা হল। চলল গুলি-গোলা। দুর্গের প্রধান ফটক উড়ে গেল। চারদিকে আগুন। দুর্গের সঞ্চিত খাদ্যশস্য বিনষ্ট হল। সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শেষে ডালিমকোট দুর্গ ব্রিটিশদের কব্জায় এল। সেখানেও একজন বাঙালি সহ তিনজনের মৃতদেহ পাওয়া গেল। মৃতদেহগুলিকে সরানো হল। ব্রিটিশ বাহিনীর আরও দুইজন সেনার মৃতদেহ পাওয়া গেল।

ডালিমকোট দুর্গ

মি. ইডেনের রচনায় ডালিমকোট দুর্গের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করা হল।

'ডালিমকোট দুর্গটি ভয়ঙ্কর জীর্ণ একটি দালানবাড়ি। মাটি ও পাথর দিয়ে গড়া ও উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা দুর্গটি উত্তর-পূর্ব দিকে একটা বড় প্রবেশদ্বার আছে। ওই দুর্গে জুঙপেন বসবাস করেন। প্রাচীরের ভেতরে বেশ কয়েকটা বাড়িঘর ও একটি বাগান আছে। সেই ঘরগুলির মধ্যে একটি ডুয়ার্সের রায়তদের থাকবার জন্য নির্ধারিত ছিল। খাজনা বা নজরানা দেবার সময়ে এখানে এলে ওরা ওই ঘরে থাকতে পারতেন। ভেতরে একটা বৌদ্ধমঠও আছে। আর আছে সেনাদের ব্যারাক, ঘোড়াশাল, খাদ্যশস্যের গুদামঘর ও মহিলাদের থাকবার জন্য একটি নিবাস। ১৭৭২ সালে ক্যাপ্টেন জোন্স মাত্র কয়েকজন লোকের সাহায্যে খুব সহজে দুর্গটি দখল করে নিয়েছিলেন। আমরা যে এখানে সৈন্য পাঠাতে পারি, জনসাধরণ ওই বিষয়ে অতটা ভাবিত ছিল না।'

ধুমসুঙ দুর্গ দখল

দার্জিলিং সীমান্ত থেকে প্রায় ২০ মাইল দূরে ধুমসুঙ দুর্গটি অবস্থিত। সেটিও পার্বত্য দুর্গ। ওই দুর্গে অভিযানের সব ব্যবস্থা করে কর্ণেল হটন ধুমসুঙ দুর্গের নেইবুকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। ১০ই ডিসেম্বর ওই চিঠির উত্তরে বশ্যতা স্বীকার করে একটি উত্তরও দিয়েছিলেন। ততক্ষণে ক্যাপ্টেন পারকিন্স একদল নির্মাণকর্মী নিয়ে ধুমসুঙ দখল করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। ডালিমকোটের ১৬ জন গ্রাম প্রধানকে বাধ্যতামূলকভাবে বশ্যতা স্বীকার করতে বলা হয়েছিল। তাদেরকে ওই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা যেন সেনাবাহিনীতে কিছু কুলি সরবরাহ করেন। ধুমসুঙ দখল করে নেন ক্যাপ্টেন পারকিন্স।

ধুমসুঙ একটি চতুষ্কোণাকৃতি ছোট্ট একটা দুর্গ। এখানকার বাড়িঘরের দেয়াল মাটি ও পাথর দিয়ে গড়া। ধুমসুঙের পরিবেশ ছিল বেশ চমৎকার। এখানে কিন্তু কোনও প্রতিরোধের ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি। মাত্র পঞ্চাশ জন সেনা নিয়ে দুর্গটি দখল করা হয়েছিল। কর্ণেল হটন দার্জিলিং থেকে লেঃ ডয়েসের নেতৃত্বে ওই সেনাদের আনিয়েছিলেন ও বিনা যুদ্ধেই দুর্গটি অধিকৃত হয়েছিল।

ধর্মরাজার ঘোষণা

১৬ই ডিসেম্বর ভুটানের ধর্মরাজা একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন। সেখানে বলা হয়েছিল—

'একথা সকলেরই জানা যে, গত বছর সিকিমের প্রজা ছেবু লামা ধর্মরাজার বিনা অনুমতিতে এবং বহুবার তাঁকে সাবধান করা সত্ত্বেও, কয়েকজন ইংরেজকে ভুটানে নিয়ে এসেছিলেন। ছেবু লামা ব্রিটিশ সরকারের স্বর্ণপদক প্রাপ্ত একজন ভৃত্য। সিকিমের রাজাকে ছেবু লামার আচরণ সম্পর্কে একটি চিঠি দিয়েও কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। তাই এখন ভুটানের ধর্মরাজা সিকিমের অধিপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কারণ,

কর্ণেল হটন, জেনারেল ডান্সফোর্ড, ক্যাপ্টেন (ব্রিগেডিয়ার মেজর) ম্যাকগ্রেগর, লেফটেনান্ট ল্যাম্যান, লে. অ্যান্ডরসন, মেজর গ্রিফীন, লে. ওয়ালার, লে. কলিন্স বিভিন্ন বাহিনীর নেতৃত্বে থাকলেন। যুদ্ধ শুরু হল। প্রতিরোধে এগিয়ে এল ভুটানি সৈন্যরা। পাথর ছুঁড়ে, তির-ধনুক ও বারুদের বন্দুক দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুললো তারা। অপর দিকে বন্দুক, আট ইঞ্চি মর্টার, পাথর ছোঁড়ার যন্ত্র দিয়ে আক্রমণ। দু'জন সৈন্য মারা গেলেন। আহত হলেন কয়েকজন। বারুদের পিপে এনে গোলন্দাজ বাহিনী প্রস্তুত। একটা মর্টারের আঘাতে একটা বারুদের পিপেতে এসে পড়ায় সেটি প্রচণ্ড শব্দে ফেটে যায়। মেজর গ্রিফীন, লেঃ অ্যান্ডরসন ও লেঃ ওয়ালার প্রাণে বেঁচে গেলেও চারজন সৈন্য সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়।

ছেবু লামাই সমস্ত অশান্তির মূল।

ধর্মরাজার সাম্রাজ্য বিস্তারের বিন্দুমাত্র প্রত্যাশা নেই। তিনি ভারতের গভর্নর জেনারেলকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে, যেন তিনি ছেবু লামা ও মি. ইডেনের কোনও কথা না শোনেন। কারণ, দু'জনই অসৎ লোক।

ধর্মরাজা চান না যে, নিরীহ প্রজাদের সামান্য রক্তপাত ঘটে। কিন্তু ইংরেজ সেনারা ভুটানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিরতির কোনও চেষ্টাই করছে না। ভুটানের প্রজারা এরই প্রেক্ষিতে এবার ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারা (ইংরেজরা) এবার ডুয়ার্স দখলের চেষ্টা করবে এবং তারপর তারা পুনাখা দখলের চেষ্টা করবে। ভুটানের নাগরিকরা অনাদি অতীতকাল থেকে স্বাধীনতা ভোগ করে এসেছেন, তা থেকে এবার তাঁরা বঞ্চিত হবেন। এ মুহূর্তে বিভিন্ন দুর্গের পেনলো ও জুঙপেনদের স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হয়ে ভুটান রক্ষায় তাঁদের বিশ্বাসযোগ্যতায় অবিচল থাকাই কর্তব্য।'

এ ঘোষণাপত্রটি ধর্মরাজার ছিল কি না সন্দেহ। কারণ, বয়সে নবীন ধর্মরাজা তখন কয়েকজনের হাতের পুতুলমাত্র। মনে হয়, ঘোষণাপত্রটির লেখক টঙসোর পেনলো। প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলাটা একটা সংকেতমাত্র।

১৯শে ডিসেম্বর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডান্সফোর্ড যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে ডালিমকোট থেকে রওনা দিয়ে প্রায় ৩০ মাইল দূরে চামুর্চি গিরিপথ অভিমুখে রওনা দিয়েছিলেন।

বুল্লিবাড়ি, তন্দু, চামুর্চি, বক্সা অভিযান

২২শে ডিসেম্বর ডালিমকোট থেকে ১২ মাইল দক্ষিণে বুল্লিবাড়ি নামক জনপদে এসে পৌছাল সামরিক বাহিনী। সেখানকার লোকজন সব ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। ২৩ তারিখে সেনারা পূর্ব দিকে জঙ্গল পথ ধরে এগিয়ে চলল। মেচ অধ্যুষিত কৃষিপ্রধান অঞ্চল এটি। এঁরাই ডুয়ার্সের আদিম জনজাতি। এঁদের মধ্যে অনেকেই সেনাবাহিনীতে ভার বহনে কাজ করছিলেন। সারাদিনের কাজের শেষে ওঁরা ক্যাম্পে এসে ভারি বোঝাগুলি বহন করে দিতেন, জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে দিতেন এবং অন্যান্য কাজও করে দিতেন। কোথাও কোনও ভুটানি বা দুর্গের চিহ্ন নেই। আসলে, ভুটানি আধিকারিকেরা এ সব সীমান্তে হয়ত কমই আসতেন। সীমান্ত অঞ্চলে ঘেরার বেড়া দিয়ে নির্দিষ্ট বাড়িতে থাকতেন।

সৈন্যবাহিনী এসে পৌছাল তন্দুতে। ডালিমকোট ও চামুর্চির মাঝামাঝি জায়গায় সুন্দর জনপদ তন্দু। সেখানে শিবির স্থাপন করা হয়েছিল। মেজর মাইনের নেতৃত্বে ১৫০ জনের একটি দল সামচি ভুটানের অবস্থা জানার জন্য এগিয়ে গিয়েছিল। চামুর্চির পূর্বনাম সামচি। যেমন ময়নাগুড়ির পূর্বনাম ছিল জামের কোট এবং ডালিমকোটের পূর্ব নাম ছিল ধালিম। ধালিমের সঙ্গে হিন্দুস্থানী কোট অর্থাৎ ফোর্ট যুক্ত হয়ে ধালিমকোট কালক্রমে ডালিমকোট-এ পরিণত হয়েছে। মেজর মাইন স্থানটির দখল ঘোষণা করেছিলেন।

চামুর্চিতে সেনাদল পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে তীর-ধনুকাদি নিয়ে আক্রমণ শুরু করেছিল ভুটানিরা। পাথর ছুঁড়ে ও গাদা বন্দুক চালিয়ে চলল আক্রমণ। রাতে দেখা গেল ১২ জন লোক আহত হয়েছেন এবং দু'জনের আঘাত মারাত্মক।

৩১শে ডিসেম্বর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডান্সফোর্ড মূল সৈন্যবাহিনী নিয়ে চামুর্চির নিচে ৭০০ বর্গ গজের একটা জঙ্গলঘেরা ফাঁকা জায়গায় ঘাঁটি গেড়ে বসলেন। মালবাহী পশুদের নিচে সরিয়ে রাখলেন। ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের ক্যাপ্টেন পারকিনস ১০০ জন লোক নিয়ে গভীর জঙ্গলে ভুটানিদের অনুসন্ধান চালালেন। ফলে, যুদ্ধ শুরু করতে পরদিন সকাল সাড়ে আটটা বেজে গিয়েছিল।

মেজর গার্স্টিন জানালেন যে, ভুটানিরা ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন। যেটুকু সংঘর্ষ হয়েছিল তাতে দু'জন নিহত হয়েছিলেন এবং আহত হয়েছিলেন তিনজন। ভুটানি সেনারা ১৩ জন নিহত লোককে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

চামুর্চিতে বাড়িঘরের সংখ্যা কুড়িটির মত।

সেখানে একটা বৌদ্ধমঠও ছিল। ওই মঠে প্রচুর প্রাচীন পুঁথি ও ধর্মীয় পবিত্র গ্রন্থাদি ছিল। পাহাড়ের উপরে একটি অর্ধ নির্মিত সেনা ছাউনি দেখা গিয়েছিল। ওই ভুটানি ছাউনি দখল করে সেখানে বেঙ্গল পুলিশের ১০০ জন লোককে থাকতে বলা হয়েছিল এবং ক্যাম্পটি পুনরায় তন্দুতে ফিরিয়ে নেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

ব্রিগেডিয়ার ডান্সফোর্ড ৫০ জন অঙ্গরক্ষককে নিয়ে পূর্বদিকে রওনা দিয়েছিলেন। এঁরা বক্সা ও বল্লা দুর্গ পরিদর্শনে যাবেন, কর্ণেল ওয়াটসন কোচবিহার থেকে রওনা দিয়ে বক্সা দুর্গ পূর্বেই দখল করে নিয়েছিলেন।

চামুর্চিতে পাহাড়ের ঢালে প্রচুর চাষাবাদি হত। এখানকার মেচ সম্প্রদায়ের লোকেরা বেশ হাড্ডাগোড্ডা। আবহাওয়াও মনোরম। ডুয়ার্সে ভুটানিরা বেশি সংখ্যায় আসতেন ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে। রাজস্ব আদায়ই থাকত প্রধান উদ্দেশ্য।

দেবরাজার নির্দেশপত্র

২৭শে ডিসেম্বর ভুটানের দেবরাজা ব্রিটিশ বাহিনীর বিগ্রেডিয়ার জেনারেলকে উদ্দেশ করে একটি নির্দেশনামা পাঠিয়েছিলেন। সেটি নিম্নরূপ—

'ভুটান একটি ছোট্ট রাজ্য। এখানে দেবরাজা দীর্ঘকাল ধরে শাসন করে পরিতৃপ্ত। দেবরাজা কখনই পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী রাজ্য চিনের তাতার, চিন বা ইংরেজদের অধিকৃত কোনও অঞ্চল দখল করতে কিংবা ওই সব দেশের প্রজাদের উপর অত্যাচার করতে উৎসাহী নয়। ইংল্যান্ডের মহারানী ও ভুটানের দেবরাজা ভাই-বোনের মত সম্পর্কিত। গত বছর মি. ইডেন যখন আমার কাছে এসেছিলেন, আমি তাঁকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা প্রদান করেছিলাম এবং ধর্মরাজার সাথে পরিচয়ও করে দিয়েছিলাম। তিনি সাধ্যমত বিষয়গুলি মিটিয়ে নিয়েছিলেন। মি. ইডেন কথা দিয়েছিলেন যে, আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠা সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিন্ন করবেন না বা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করবেন না। কিন্তু ওই প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও আপনি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এটা আমার পছন্দ নয়। আপনি আমাকে যুদ্ধের জন্য কোনও সতর্কবাণী পাঠাননি। এমন কী যুদ্ধের অভিপ্রায়ও জানাননি। আপনি হঠাৎ করে আমাদের অধিকারে থাকা জনপদগুলি দখল করে চলেছেন। আমাদের সকল প্রজাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। আমাদের সব দুর্গ দখল করে নিচ্ছেন ও সেগুলি পুড়িয়ে দিয়ে প্রচুর ক্ষতিসাধন করছেন।

আপনাদের মত লোক যাঁরা আমাদের বন্ধু, আমি কখনওই ভাবতে পারিনি, তাঁরা এমন কাজ করতে পারেন। তাছাড়া আমি বিশ্বাসও করি না যে, ইংল্যান্ডের মহারানী আপনাকে আমাদের দেশ দখল করার অনুমতি দিয়েছেন। যখন দু'জন রাজা যুদ্ধ করতে মনস্থ করেন, তখন তারা একটা সময় স্থির করে নেন যে, কখন যুদ্ধ শুরু হবে। এটাই আমাদের দেশের রীতি এবং যখন একপক্ষ পরাজিত হন, তখন তাঁর আর ওই দেশের অধিকার থাকে না। কিন্তু আপনি যদি ডাকাতি করে আমাদের দেশের অধিকার লুণ্ঠন করেন, যা আপনি করছেনও, সেটা এখন আপনার ইচ্ছানুসারে ঘটছে বলে আপনি সন্তুষ্ট থাকতে পারেন। কিন্তু, আমি মনে করি না যে, আমি যুদ্ধ না করলেও আপনি আমাদের দেশ অধিকার করে নিয়েছেন।

আপনি যে সমতলভূমি অধিকার করে নিয়েছেন, তা আপনি অধিকারে রাখতে পারবেন না। আমি আপনাকে আমার কথা শুনতে পরামর্শ দিচ্ছি। কিন্তু, আপনি যদি তা না করে থাকেন, তবে ভবিষ্যতে আমি আপনার কোনও কথাই শুনবো না। আপনি যদি শান্তিই চান, এবং আমাদের দেশকে বিব্রত না করতে চান, তবে এখনই আপনার পক্ষে তল্পিতল্পা গুটিয়ে, আমাদের আর কোনও ক্ষতি না করে, নিজের দেশে ফিরে যাওয়াই যথোচিত কাজ হবে। কিন্তু, আপনি যদি আমার এই ছোট্ট রাজ্যটিকে বিনা যুদ্ধেই ক্ষমতাভুক্ত করতে চান এবং আপনার বৃহৎ রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত করতে চান, তাহলে আমি দশ জন দেবতার দৈব বাহিনীকে আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠাবো। ওঁরা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অপদেবতা। ওই সেনাদলের মধ্যে ৭০০০ জন

চামুর্চিতে বাড়িঘরের সংখ্যা কুড়িটির মত। সেখানে একটা বৌদ্ধমঠও ছিল। ওই মঠে প্রচুর প্রাচীন পুঁথি ও ধর্মীয় পবিত্র গ্রন্থাদি ছিল। পাহাড়ের উপরে একটি অর্ধ নির্মিত সেনা ছাউনি দেখা গিয়েছিল। ওই ভুটানি ছাউনি দখল করে সেখানে বেঙ্গল পুলিশের ১০০ জন লোককে থাকতে বলা হয়েছিল এবং ক্যাম্পটি পুনরায় তন্দুতে ফিরিয়ে নেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ব্রিগেডিয়ার ডান্সফোর্ড ৫০ জন অঙ্গরক্ষককে নিয়ে পূর্বদিকে রওনা দিয়েছিলেন। এঁরা বক্সা ও বল্লা দুর্গ পরিদর্শনে যাবেন, কর্ণেল ওয়াটসন কোচবিহার থেকে রওনা দিয়ে বক্সা দুর্গ পূর্বেই দখল করে নিয়েছিলেন।

চামুর্চিতে, ৫০০০ জন দুর্মাতে, ৯০০০ জন বক্সাতে এবং ডালিমকোটে ১,০২,০০০ জন অবস্থান করবেন।

আপনি তো ইতিমধ্যে আমাদের দেশের প্রচুর ক্ষতি করেছেন। অনুগ্রহ করে আর ক্ষতির পরিমাণ বাড়াবেন না। এ মুহূর্তে আমার এটাই পরামর্শ যে, আপনি দয়া করে আপনার দেশে ফিরে যান এবং আমাদের সঙ্গে শান্তি বজায় রাখুন। আমি আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন ছিন্ন করিনি, কিন্তু আপনি যদি আপনার সেনাবাহিনী প্রত্যাহার না করেন, তাহলে আপনি এ মুহূর্তেই পুনাখাতে আমাকে চিঠি লিখে জানান।'

বল্লা, বক্সা, সন্তরাবাড়ি

ওই চিঠির কোনও গুরুত্বই দেয়নি ব্রিটিশ সরকার। ২৮শে নভেম্বরই কোচবিহার থেকে কর্ণেল ওয়াটসনের নেতৃত্বে একটি দল বক্সাদুয়ারের অবস্থা সরেজমিনে তদন্ত করতে বক্সায় হাজির হয়েছিল। ৭ই ডিসেম্বরে পাশাখা বা বক্সা দুর্গ দখল করা হয়েছিল। দু'দিন পরে দেখা গিয়েছিল যে, বক্সা দুর্গ অত্যন্ত ভগ্নদশায়। ওখানকার সামরিক শিবিরের না ছিল বহিঃ প্রাচীর, না ছিল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার তেমন বন্দোবস্ত। একটা মাত্র চিন দেশিয় বন্দুক ছিল এবং তা অকেজো। যে পাহাড়ে বক্সা অবস্থিত, সেটি একটি ছোট পাহাড় কিন্তু ওই পাহাড়ের গায়ে বেড়ে উঠেছে আরও পাহাড়। চারদিকে ঘন জঙ্গল। যে গোর্খা দলটি সেখানে গিয়েছিল, তারা সামান্য আক্রমণ করাতে ভুটানিরা ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। এখান থেকে একটি রাস্তা পুনাখা পর্যন্ত প্রসারিত। রাস্তাঘাট মোটামুটি ভালই। পাথর বিছানো পথ। ছায়াদানকারী গাছ ও উইলো গাছ সেখানে ছিল।

সেখান থেকে নিচে নেমে সমতলে পশ্চিমমুখী চলতে থাকল সেনাদল। লক্ষ্য বল্লা গিরিপথ। এখান থেকে লক্ষ্মীদুয়ার দুর্গটি দেখভাল করা হয়। সেটিও সহজে দখল করে ছোট্ট সেনা শিবিরে কয়েকজন সেনাকে রেখে কর্ণেল ওয়াটসন সন্তরাবাড়িতে শিবির স্থাপন করেছিলেন। ওই স্থানটি পাহাড়ের পাদদেশেই অবস্থিত। এখান থেকে বক্সা ও চেচাখাতায় যাবার দু'টি পথ।

ডুয়ার্স ব্রিটিশ অধিকারে আসায় সেখানকার জনসাধারণ অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন বলে সার্জেন রেনীর অভিমত। স্থানীয় লোকেরা নাকি সেনাদলকে নানাভাবে সাহায্য করবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। সন্তরাবাড়িতে নদীর শুকনো বুকে সামান্য পরিমাণে কয়লা দেখতে পেয়েছিলেন সার্জেন রেনী।

অসম সীমান্তে যুদ্ধ

উত্তরের দুই সৈন্যব্যূহ কর্ণেল ক্যাম্বেল এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুলকাস্টারের নেতৃত্বে ২রা ডিসেম্বর গৌহাটিতে ব্রহ্মপুত্র নদ পেরিয়ে নদের ডান তীরে শিবির স্থাপন করেছিলেন। সেখান থেকে পরদিন সীমান্ত অভিমুখে যাত্রা করা হবে। যেতে হবে কুমারকাটায়। সেটাই হবে অগ্রবর্তী অস্থায়ী শিবির। ওই স্থানের দূরত্ব গৌহাটি থেকে ৪১ মাইল এবং দরং গিরিপথের দেওয়ানগিরিতে অস্থায়ী শিবির হবে ভুটান পাহাড় থেকে ১৫ মাইল দূরে।

পরদিন কুমারকাটায় পৌঁছে ক্যাপ্টেন ম্যাকডোনাল্ডকে বাংলা পুলিশের ১৫ জন সেনাসহ অগ্রবর্তী দলটিকে পাঠানো হয়েছিল।

দেওয়ানগিরি

৯ই ডিসেম্বরে একটি বাহিনী ৬ মাইল অতিক্রম করে দরং গিরিপথের কাছাকাছি পৌঁছেছিল এবং পরদিন ওই দল পাহাড়ে উঠতে থাকে। পাথুরে রাস্তা প্রচণ্ড খারাপ। ঘন ঘন নদী-ঝরনা পেরোতে হতে থাকে। লে. পিটের নেতৃত্বে একদল সেনা ওই গিরিপথ দিয়ে ৬ মাইল উপরে উঠে একটি ভুটানি সৈন্যশিবির দেখতে পেয়েছিল। সেখান থেকে অনবরত পাথর ও দেশিয় বন্দুকের গুলি ছোঁড়া হতে থাকে। এতে একজন দেশিয় লোক আহত হয়ে পড়েছিল। স্থানটি দারুঙ্গা গিরিপথের শেষাংশ।

ব্রিটিশ সেনারা গুলিবর্ষণ শুরু করে। জেনারেল মুলকাস্টার সেদিনের রাত কাটানো ও সৈন্য সাজানোর জন্য জঙ্গলে উপযুক্ত স্থান খুঁজে দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরের দিন সেখান থেকে যাত্রা মুহূর্তে জানা গেল যে, ক্যাপ্টেন ম্যাকডোনাল্ড অন্যপথ দিয়ে গিয়ে দেওয়ানগিরি দখল করে

নিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে ছিল মাত্র ৫০ জন পুলিশ সেনা। ওই চিঠি জেনারেলের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তিনি ক্যাপ্টেন নরম্যানকে এগিয়ে গিয়ে ঘটনাটা তদন্ত করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে দেখা গেল, আত্মরক্ষার জন্য চার দিকে দেয়াল দিয়ে ঘেরা একটা জায়গা গিরিপথের মুখেই শূন্য পড়ে আছে। কাছাকাছি কোনও ভুটানি লোক নেই। বিগ্রেডিয়ার জেনারেল মুলকাস্টার সেটি দখল করে বিজয়সূচক গুলিবর্ষণ করেন। দেওয়ানগিরির যুদ্ধে একজন গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন এবং কয়েকজন ভুটিয়াও নিহত হয়েছিলেন। আহতের সংখ্যা পাঁচ।

ক্যাপ্টেন পেম্বারটনের সঙ্গে ডা. গ্রিফিথস ১৮৪০ সালে দেওয়ানগিরিতে এসেছিলেন। ডা. গ্রিফীথসের বর্ণনায় দেওয়ানগিরি সম্পর্কে জানা যায়—

'অসম থেকে দেওয়ানগিরির যে মন্দিরগুলি দেখা যায়, সেগুলি পাহাড়ের চূড়ায় সমুদ্রতল থেকে ২,১০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। সমতলভূমি থেকে ওই মন্দিরগুলির উচ্চতা ১৯৫০ ফুট। (সম্ভবত অসম ডুয়ার্সের সমতল)। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে দূরে দূরে গ্রামগুলি উত্তরমুখী পথের ধারে অবস্থিত। বাড়িগুলি বেশিরভাগই কুড়ে ঘর এবং বাড়ির সংখ্যা শ'খানেক হবে। তিন চারটি বিচ্ছিন্ন বসতিতে সে সব গড়ে উঠেছে। পাথরের দেয়াল দিয়ে তৈরি বাড়িগুলি বেশি বড় নয়। ওই সবের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর পাকা বাড়িটির মালিক একজন সুবা। পদ মর্যাদায় তিনি নিচের দিকেই। পাহাড়ের খাঁজে তিন-চারটি সাধারণ বৌদ্ধমঠ। ওই মন্দিরগুলিতে বৌদ্ধধর্মীয় বাণী সম্বলিত নিশানে লম্বালম্বিভাবে লিখিত এবং বাঁশের খুঁটির সাহায্যে দেওয়ালের গায়ে প্রোথিত। দেওয়ালগুলিতেও কিছু স্মারকলিপি দিয়ে খোদিত এবং সেগুলো বিবর্ণ। পাহাড় কেটে শ্লেটের মত সমতল ক্ষেত্র তৈরি করে কিছু ধর্মীয় বাণী উৎকীর্ণ করা হয়েছে। নোংরা আবর্জনায় গ্রামটি ভরা। পাহাড়ের খাঁজের মাঝখানে শরীরচর্চার জন্য একটা প্রশস্ত মল্লভূমি আছে। ওই খোলা জায়গার চারপাশে ছবির মত গাছপালা, বিশেষত কিছু ডুমুর গাছ একটি বড় বটগাছ আছে। গাঁয়ের কাছাকাছি কোনও নদী বা ঝরনা নেই। বেশ কিছুটা দূরত্ব থেকে বাঁশের ফাঁপা নল দিয়ে প্রয়োজনীয় জল আনা হয়।

সুবাকে আমাদের বেশ ভদ্র ও নম্র বলেই মনে হল। তিনি আমাদের বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণে আপ্যায়িত করেছিলেন। তাঁর ঘরটিও খুব সুন্দরভাবে সাজানো এবং ছবির মত। চৈনিক ধার্মিক পদাধিকারীর বাড়ির মতই ওই বাড়িটি সুন্দর। ইনি ধর্মরাজার প্রতিনিধি হিসেবে এখানে প্রধান ও অভ্রান্ত ব্যক্তিরূপে মান্যতা পেয়ে থাকেন। আমরা সঙ্গীত মূর্ছনার মধ্য দিয়ে তাঁর কাছে রাজকীয় অভ্যর্থনা পেয়েছিলাম। এত দূরবর্তী স্থানে এসেও ওই বাড়িটি দেখে আমার মনে হয়, এটি যেন সুইজারল্যান্ডের বাড়ির একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। যেহেতু তাঁর পদমর্যাদা ছোট, তাই বাড়িটিও ছোট্ট। সুবা ভদ্রলোকটির সান্নিধ্যে এসে আমাদের ধারণা হল, অনেক উচ্চপদস্থ লোকের সান্নিধ্যে এলেও, তাঁর মত ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ হয়ত আমরা আর পাব না। তাঁর অনুরাগীর সংখ্যা হয়ত বেশি নয়। এমন লোক দু'একজন হয়ত আছেন, যাঁরা লম্বাটে লোহিত বর্ণের পোশাকে সজ্জিত হতে পারেন, সাধারণ লোকের চাইতে ভাল পোশাক পরতে পারেন, কিন্তু তাঁর মত মান্য হতে পারেন না।

এখানকার জনসাধারণ সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। আমাদের সেখানে থাকবার সময়ে তিব্বতি (কাম্পা) লোকেদের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। এঁরা হাজো পাহাড়ে যাবার আগে এখানে সমবেত হয়েছেন। এখানকার বেশিরভাগ অধিবাসী হলেন ভুটিয়া। এঁদের গড়ন মজবুত এবং ভুটানে যাদের দেখেছি, তাদের মধ্যে সুন্দরতম ও ভদ্র। সত্যি কথা বলতে কী, এঁরা সবসময়ে সামাজিকভাবে বিনয়ী গো-মহিষাদি পালন প্রায় ছেড়ে দিয়ে অসমের মিথুন লালন পালন করেন সামান্য। পশুগুলোকে যথাসম্ভব যত্ন করেন ও রাতে বেঁধে রাখেন। এঁদের বলদগুলি দেখতে সুন্দর ও অনুগত। টাট্টুঘোড়া ও খচ্চর বেশি নেই এ গ্রামে। শুয়োর ও মুরগি এঁরা পালন করেন না।'

নিঃসন্দেহে এটি দেওয়ানগিরির সুন্দর বিবরণ। ১৮৬৪ সালে ওই দেওয়ানগিরি দখল করে নেবার পর, দেখা গেল সেখানে মাত্র তিনটি মন্দির ও সামান্য কিছু ঘরবাড়ি। জেনারেল মুলকাস্টার কড়াভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, মন্দিরগুলির যেন ক্ষতিসাধন না করা হয়। একটি মন্দিরে তো বড় একটা পাঠাগার আছে। সেখানে আছে কয়েক হাজার ধর্মীয় পুস্তক। জুঙপেনের বাড়িতেও তিব্বতি ভাষায় লেখা বহু প্রাচীন পুঁথি দেখা গিয়েছিল। দেওয়ানগিরি দখল করার তিন-চারদিন পরে প্রাক্তন জুঙপেন ও কয়েকজন জিনক্যাফ সেখানে বসবাস করার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। সেখানে সকলকে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বসবাসের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

(ক্রমশ)

ব্রিটিশ সেনারা গুলিবর্ষণ শুরু করে। জেনারেল মুলকাস্টার সেদিনের রাত কাটানো ও সৈন্য সাজানোর জন্য জঙ্গলে উপযুক্ত স্থান খুঁজে দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরের দিন সেখান থেকে যাত্রা মুহূর্তে জানা গেল যে, ক্যাপ্টেন ম্যাকডোনাল্ড অন্যপথ দিয়ে গিয়ে দেওয়ানগিরি দখল করে নিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে ছিল মাত্র ৫০ জন পুলিশ সেনা। ওই চিঠি জেনারেলের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তিনি ক্যাপ্টেন নরম্যানকে এগিয়ে গিয়ে ঘটনাটা তদন্ত করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে দেখা গেল, আত্মরক্ষার জন্য চার দিকে দেয়াল দিয়ে ঘেরা একটা জায়গা গিরিপথের মুখেই শূন্য পড়ে আছে। কাছাকাছি কোনও ভুটানি লোক নেই। বিগ্রেডিয়ার জেনারেল মুলকাস্টার সেটি দখল করে বিজয়সূচক গুলিবর্ষণ করেন।

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:15,000
Full Page, B/W: 9,000
Half Page, Colour: 8,000
Half Page, B/W: 6,000
Back Cover: 30,000
Front Inside Cover: 20,000
Back Inside Cover: 20,000
Double Spread: 30,000

Special Rates for Local Trade only

Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page
Bleed {21cm (W) X 28 cm (H)}, Non Bleed {18cm (W) X 25 cm (H)}, Half Page Horizontal {18 cm (W) X 12 cm (H)}, Vertical {8.5 cm (W) X 25 cm (H)}, Strip Ad Vertical {5.6 cm (W) X 25 cm (H)}, Horizontal 18 cm (W) X 6.5 cm (H), 1/4 Page 8.5 cm (W) X 12 cm (H), 1/6 Page {5.75 cm (W) X 12.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2018 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে মতান্তরে গান্ধীজীকে কতটা দায়ী করা যায়?

গৌতম রায়

গান্ধীজী এবং সুভাষচন্দ্রের ভিতর যে মতপার্থক্য, সেটির সময়কাল কিন্তু দু বছরের কম। কিন্তু তার পরিব্যক্তি সময়কে অতিক্রম করে, মহাকালের বুকে এক গভীর ক্ষত অঙ্কন করেছে। ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই ১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত, অর্থাৎ সুভাষ চন্দ্রের অন্তর্ধানের সময়কাল এই মতপার্থক্যের ব্যপ্তি। এই দুটি বছরের রাজনৈতিক ইতিহাস বহু তিক্ততার আগলে আবদ্ধ।

১৯৩৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি ভারতবর্ষ এবং বিশ্বের প্রবাহমান রাজনীতি সম্পর্কে ওয়ার্ধার সেবাশ্রমে গান্ধীজির সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের দীর্ঘ আলোচনা হয়। সুভাষচন্দ্র তখন কংগ্রেস সভাপতি। মনে রাখা দরকার সুভাষচন্দ্র যখন প্রথমবার কংগ্রেস সভাপতি হন, তখন গান্ধীজীর অনুমোদনক্রমে জওহরলাল নেহরু তাঁর নাম উত্থাপন করেছিলেন। সকলের বিপুল উৎসাহের মধ্য দিয়ে সেই নাম সমর্থিত হয়েছিল।

ঘটনার অল্প সময়ের ভেতরেই গোটা বিশ্বের রাজনৈতিক পর্যায়ক্রমে একটা বড় রকমের পরিবর্তন দেখা দেয় যা ভারতবর্ষের রাজনীতিকে ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত করবার ইঙ্গিতবাহী ছিল। সুভাষচন্দ্র তাঁর অতীতের ইউরোপ অবস্থানকালের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিলেন যে, জার্মানির পক্ষ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটা জোরদার প্রস্তুতি চলছে। জার্মানির এই শক্তি সঞ্চয়ের বিষয়টি যে অন্য দেশগুলোর কাছে অজানা নয় সেটি সুভাষচন্দ্র বুঝেছিলেন। ফ্রান্স, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ইতালি, ইংল্যান্ড ইত্যাদি দেশগুলি নানা আতংকের ভেতর দিয়েও যে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে, সেটা উপলব্ধি করেই সুভাষচন্দ্র মনে করেছিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ ভারতবর্ষকে নিতে হবে পরাধীনতার শৃংখলমুক্তির জন্য। এটা ভারতবর্ষের সামনে একটা বড় রকমের সুযোগ। পরাধীন জাতির কাছে শত্রুর শত্রুই মিত্র হতে পারে, রিয়েল পলিটিক্সের এই সূত্র সুভাষচন্দ্রের কাছে খুব বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল।

অথচ অন্যদিকে গান্ধীজী শত্রুর বিপদের সুযোগ নেওয়ার বিষয়টিকে কোনও অবস্থাতেই অহিংসার আদর্শ হিসেবে পরিগণিত করতে পারেন নি। জওহরলাল ও তৎকালীন ফ্যাসিবিরোধী প্রগতিবাদীদের অভিমত ছিল যে, এমন কোনও পদক্ষেপ নেওয়া সঠিক কাজ নয়, যা ফ্যাসিবাদি হিটলারের পক্ষে যায়। কারণ ভারতবর্ষে যে ফ্যাসিবিরোধী চিন্তা-চেতনা অঙ্গীভূত হয়েছিল সে বিষয়টির দিকে দৃষ্টি রাখার প্রতি তাঁরা সহমর্মিতা জ্ঞাপন করে যাচ্ছিলেন।

১৯৩৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি গান্ধীজীর সঙ্গে বৈঠকে সুভাষচন্দ্র প্রস্তাব রাখলেন, অবিলম্বে ব্রিটিশ সরকারের কাছে ভারতের স্বাধীনতার দাবি একটি আল্টিমেটাম হিসেবে রাখা হোক, এবং সঙ্গে সঙ্গে গোটা দেশকে আইন অমান্য আন্দোলন ও সত্যাগ্রহের জন্য প্রস্তুত করা হোক। গোটা নেতৃত্ব গান্ধীজী নিজের হাতে তুলে নিন।

দেশের সাতটি রাজ্যে তখন কংগ্রেস সরকার। ব্রিটিশের পক্ষ থেকে গোটা দেশের জন্য কেন্দ্রীয় ফেডারেশনের প্রস্তাব ইতিমধ্যেই উপস্থাপিত হয়েছে। ফেডারেশনে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত একটা স্পষ্ট রূপ নিলেও, কংগ্রেসের ভেতরকার দক্ষিণপন্থী এবং সংগ্রাম বিরোধী অংশ, তাঁরা কিন্তু ফেডারেশনের প্রস্তাব একটু অদল-বদল করে নেওয়ার লোভ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতে পারছিলেন না।

ব্রিটিশের সঙ্গে একটা আপসের ভেতর দিয়ে দিল্লিতে শাসন ক্ষমতায় বসার প্রতি তাঁদের একটা মোহ কিন্তু তৈরি হয়ে গিয়েছিল তখন। যে সাতটি রাজ্যে কংগ্রেস সরকার পরিচালনা করছিল সেখানকার মন্ত্রীরাও ক্ষমতা ভোগের অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ক্ষমতার অলিন্দ থেকে নেমে এসে আবার সংগ্রামের রাস্তায় আসার পক্ষে তাঁরা আদৌ রাজি ছিলেন না। ব্রিটিশের পক্ষ থেকেও নানা ধরনের দালালদের রাজনীতির আসরে নামিয়ে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াইয়ের কার্যক্রমকে ওলট-পালট করে দেওয়ার একটা ভয়াবহ চেষ্টা ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছিল।

এই পরিস্থিতির মধ্যেই পন্থ প্রস্তাব রাজনীতির সামগ্রিক প্রেক্ষাপটটিকে বদলে দেয়। এই প্রস্তাবটি ত্রিপুরী কংগ্রেসের সামনে উপস্থাপিত করা হয় এবং সেটি ভোটে জিতে যায়। সুভাষচন্দ্রের পক্ষের লোকেরা এই প্রস্তাবের বিরোধিতায় পরাজিত হয়। ব্রিটিশ এই সময়ে সুভাষচন্দ্রের অনুগামীদের উপর নানা ধরনের অত্যাচার চালিয়ে কংগ্রেসের ভেতরের বিভাজন প্রক্রিয়াকে তীব্র করে তোলার জন্য সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করে। এই চেষ্টার একটি বড় পর্যায় হল বিহারের বিখ্যাত কৃষক নেতা স্বামী সহজানন্দকে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করে,

কংগ্রেসের সঙ্গে সুভাষ চন্দ্রের দূরত্ব এবং গান্ধীজির সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের দূরত্ব তৈরিতে ব্রিটিশ প্রাণপণ শক্তিতে আত্মনিয়োগ করে।

এসময় কংগ্রেস সোস্যালিস্ট নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণকে বন্দি করা হল। এই বন্দিদশা থেকে জয়প্রকাশ গোপনে লোক মারফত সুভাষচন্দ্র কাছে একটি দীর্ঘ চিঠি পাঠিয়েছিলেন, যেখানে জয়প্রকাশ তাঁর ভুল স্বীকার করে, সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা প্রকাশ করে কতগুলি প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। দুঃখের বিষয় হল জয়প্রকাশের এই চিঠি যখন সুভাষচন্দ্রের হাতে পৌঁছোয়, তখন তাঁর দেশ ত্যাগ করে, বিদেশে গিয়ে সশস্ত্র পদ্ধতিতে ব্রিটিশ বিরোধী অভিযানের সমস্ত পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। তাই সুভাষচন্দ্রের পক্ষে জয়প্রকাশ চিঠিকে কেন্দ্র করে আর নতুন করে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভবপর হয় নি।

তবে একথা মনে রাখা দরকার যে জাপানে চলে গিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ পুনর্গঠন করে, রেডিও মারফত যখন প্রথম বক্তৃতা করেন সুভাষচন্দ্র, সেখানে তিনি প্রথমেই গান্ধীজিকে তাঁর প্রণাম জানিয়ে, ভারতের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। এমনকি তাঁকে 'জাতির পিতা' বলে সম্মোধন করতে এতটুকু দ্বিধান্বিত হন নি।

অপরপক্ষে গান্ধীজী এবং সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিগত ভক্তেরা এই দুই মহান ব্যক্তিত্বের ভেতর সংঘাত ঘিরে ইতিহাসবোধের প্রকৃত সত্তা থেকে সরে গিয়ে বহু মনগড়া তত্ত্বের অবতারণা করলেও, ব্যক্তি গান্ধী কিন্তু ব্যক্তি সুভাষচন্দ্রের প্রতি তাঁর স্নেহ-ভালবাসা কোনও দিনের জন্য সংকুচিত করেন নি। এমনকি সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু ঘিরেও গান্ধীজী চরম সংশয়ী ছিলেন বলে জানা যায়।

এই পর্যায়ে, এই দুই মহান নেতৃত্বের ভেতর রাজনৈতিক বিরোধের প্রভাবজনিত বিষয়গুলি আমাদের একটু ভেবে দেখা দরকার। পন্থ প্রস্তাব সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর মতামত চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। গান্ধীজীর তখন রাজকোট সমস্যা, সেখানকার সত্যাগ্রহ এবং সেই কারণ জনিত অনশন ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে যথেষ্ট ব্যস্ত এবং ব্যক্তিগতভাবে অসুস্থ। গান্ধীজীর সম্পূর্ণ অগোচরে একাংশের দক্ষিণপন্থীরা এই প্রস্তাব ঘিরে এমন একটি প্রচার চালিয়েছিলেন যেখানে বলা হয়েছিল যে, গান্ধীজিকে দেখিয়েই ও তাঁর সম্মতিক্রমে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে। অথচ বাস্তবে কিন্তু আদৌ তা হয় নি। প্রস্তাবটি উত্থাপিত হওয়ার অনেক পরে এলাহাবাদে এসে গান্ধীজী সেটি দেখেন। সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের সভাপতি হওয়ার পর গান্ধীজি যখন রাজকোট নিয়ে নানা ধরনের রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে রয়েছেন এবং ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্ট অসুস্থ, সেই রকম একটি পরিস্থিতিতে গান্ধীজীর এক অনুগামী তাঁকে বলেন, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মান সম্মান রক্ষার জন্য একটি প্রস্তাব অনুমোদন করা হবে। সেই প্রস্তাবটি যে আদৌ পন্থ প্রস্তাব, সে ব্যাপারে গান্ধীজী কোনওরকম কিছু জানতেন না। ফলে প্রস্তাবটির বিষয়বস্তু কিছু না জেনেই গান্ধীজি সেই প্রস্তাব সম্পর্কে স্পষ্টভাবে আপত্তিজনক কোনও কথা বলেন নি। এরপরে সুভাষচন্দ্র যখন একাধিকবার গান্ধীজীর এই প্রস্তাব সম্পর্কে স্পষ্ট মতামত দাবি করেন, তখন '৩৯ সালের ১০ই এপ্রিল রাজকোট থেকে একটি চিঠিতে গান্ধীজী খুব পরিস্কারভাবে বলে দেন, পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব আমার দ্বারা ইন্টারপ্রেট করা নয়, প্রস্তাবটিকে আমি যত অনুধাবন করেছি, তার থেকে বেশি এটিকে অপছন্দ করেছি।

এই অবস্থায় কংগ্রেসের সংবিধান অনুযায়ী সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক এই প্রস্তাবটিকে কংগ্রেস সদস্যদের সম্মান এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের দিক থেকে বিচার করে, সেটির অনুমোদনের ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র কোনওরকম অন্তরায় হয়ে দাঁড়ান নি। এই পন্থ প্রস্তাব অনুযায়ী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নতুন সদস্যদের বেছে নেওয়ার পূর্ণ অধিকার গান্ধীজীর হাতে অর্পণ করা হয়েছিল কিন্তু সেই অধিকার নিজের হাতে তুলে নিতে গান্ধীজী কোনও অবস্থাতে সম্মত ছিলেন না। গান্ধীজী অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন; সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে নিজের পছন্দ অনুযায়ী নতুন সদস্য মনোনীত করে নেবেন এবং অকুতোভয়ে নিজের কর্মসূচি অনুযায়ী কংগ্রেস এবং দেশকে পরিচালিত করতে অগ্রসর হবেন।

এই অবস্থায় সুভাষচন্দ্র বুঝেছিলেন যে কেবল তাঁর নিজের পক্ষের লোক আর বামপন্থীদের নিয়েই যদি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তিনি তৈরি করেন তাহলে কংগ্রেসে একটি বড় ধরনের ভাঙন নেমে আসবে। আর তার ফলে দেশের ক্ষতি হবে। সুভাষচন্দ্রের পন্থ প্রস্তাব সম্পর্কে একাধিকবার গান্ধীজীর কাছে তাঁর মনোভাব জানতে চাওয়ার পর, গান্ধীজী অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় '৩৯ সালের ১০ই এপ্রিলের চিঠিতে বলেছিলেন; আমাকে কেউ তোমার বিরুদ্ধে নিযুক্ত করে নি। সেবাগ্রামে আমি তোমাকে যা বলেছিলাম, তা সম্পূর্ণভাবে আমার নিজস্ব পর্যবেক্ষণ। তুমি যদি মনে কর যে, তোমার একজন একক ব্যক্তিগত শত্রু এই বৃদ্ধটির মধ্যে লুকিয়ে আছে, তাহলে তুমি তোমার মূল্যায়নে খুব ভুল করছ।

পন্থ প্রস্তাব অনুযায়ী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নতুন সদস্যদের বেছে নেওয়ার পূর্ণ অধিকার গান্ধীজীর হাতে অর্পণ করা হয়েছিল কিন্তু সেই অধিকার নিজের হাতে তুলে নিতে গান্ধীজী কোনও অবস্থাতে সম্মত ছিলেন না। গান্ধীজী অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন; সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে নিজের পছন্দ অনুযায়ী নতুন সদস্য মনোনীত করে নেবেন এবং অকুতোভয়ে নিজের কর্মসূচি অনুযায়ী কংগ্রেস এবং দেশকে পরিচালিত করতে অগ্রসর হবেন।

এই পরিস্থিতির ভিতরে ১৯৩৯ সালের ১৭ই এপ্রিল জামাডোবা থেকে ইংল্যান্ডে অবস্থানকারী ভাইপো অমিয়নাথ বসুকে সুভাষচন্দ্র যে চিঠি লেখেন, সেই চিঠিতে জওহরলাল নেহরুর প্রতি নিজের ব্যক্তিগত অসূয়া স্পষ্ট করে তুলেছিলেন। সুভাষচন্দ্র নেহরুর সাথে নিজের অবস্থানকে বর্ণনা করেছিলেন ত্রিপুরির সেই বৃদ্ধ পাহারাদারের সঙ্গী হিসেবে। স্পষ্টতই তিনি বলেছিলেন নেহেরু নাকি সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে নেতিবাচক প্রচারে লিপ্ত রয়েছেন। সুভাষচন্দ্রের চিঠিটি থেকে খুব পরিস্কারভাবে বুঝতে পারা যায় যে নেহরুর সঙ্গে একটা বড় রকমের ব্যক্তিত্বের সংঘাতে নিজেকে লিপ্ত করে ফেলেছিলেন সুভাষচন্দ্র। রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বিরোধের থেকেও অনেক উর্ধ্বে ব্যক্তিত্বের সংঘাতে এই দুই রাজনীতিক পরস্পর পরস্পরের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার ফলে, ভারতের রাজনীতির তৎকালীন গতিপ্রকৃতি যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত যে হয়েছিল, এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

গান্ধীজীর যে গভীর লক্ষ্য ছিল বিশ্বের লড়াইয়ের ইতিহাসে একটি নতুন হাতিয়ার হিসেবে অহিংসাকে উপস্থাপিত করা, একটি সংগ্রামের নতুন অভিমুখ রচনা করা, যার নাম অহিংস সংগ্রাম, সেই লক্ষ্যে সুভাষচন্দ্রের আস্থার জায়গায় যে দোদুল্যমানতা ছিল, সেই বিষয়টিকে যদি আমরা আমাদের বোধের মধ্যে উপস্থাপিত না করে, এই দুই রাজনীতিকের সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে আলোচনা করি, তাহলে ইতিহাসের প্রতি আমরা সুবিচার করব না।

রাজকোটের প্রজা আন্দোলন এবং সেই উপলক্ষে গান্ধীজীর যে অনশন কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে কিন্তু সুভাষচন্দ্র সেটিকে কখনোই ভালো চোখে নিতে পারেন নি। এমনকি রাজকোটের ঘটনাবলী সম্পর্কে তৎকালীন বড়লাটের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা বা ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার মরিস গাওয়ারের মধ্যস্থতা সুভাষচন্দ্র অনুমোদন করতে পারেন নি। আর রাজকোটের বিষয়ে গান্ধীজীও সাফল্য আনতে পারেন নি।

এটি সুভাষচন্দ্রের পক্ষে গান্ধীজীর রাজনীতির একটি নেতিবাচক দিক হিসেবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে বড় সহায়ক শক্তি হিসেবে উঠে এসেছিল। গোটা দেশের রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন না করে, রাজকোটের রাজা ঠাকুর সাহেবের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর লড়াই, তার সামগ্রিকতার বিচারে সুভাষচন্দ্র আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না। অর্থাৎ গোটা দেশের রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একটি প্রতীক হিসেবে যে গান্ধীজী রাজকোটে রাজা ঠাকুর সাহেবের বিরুদ্ধে লড়াইকে তুলে ধরেছিলেন এবং সেখানকার প্রজা আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছিলেন— এই বিচার-বুদ্ধির সঙ্গে সুভাষচন্দ্র কখনও নিজের সাযুজ্যতা অনুভব করতে পারেন নি। এমনকি রাজকোটে প্রজাদের নিজের দায়িত্ব পালনের পথ থেকে তাদেরকে বিরত রেখে, কেবলমাত্র গান্ধীজী একা তাঁদের হয়ে লড়াই করে, বা অনশন করে কেন অহেতুক মরে যাবেন— এটাই ছিল সুভাষচন্দ্র যুক্তি।

গান্ধীজীর সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক মূল্যবোধ এখানেই নিহিত আছে যে, তিনি সর্বসাধারণকে, এমনকি গ্রামের মেয়েদের পর্যন্ত টেনে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন সংগ্রামের ময়দানে। এই সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে কোথায় ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটছে, সেই প্রশ্নে যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ থাকলেও, গান্ধীজীর নেতৃত্বে সংগ্রাম দেশের আপামর জনসাধারণকে আন্দোলন-লড়াইয়ের পথে নিয়ে যেতে সেভাবে উদ্বুদ্ধ করে নি— সুভাষচন্দ্রের এই অভিযোগের ইতিহাসগত কোনও সার্থকতা আছে কিনা তা আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করে দেখা দরকার।

সুভাষচন্দ্র এবং তাঁর দাদা শরৎচন্দ্র ও তাঁদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের

পর্যায়ক্রমের ক্ষেত্র আলোচনা প্রসঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের তৎকালীন সভাপতি মওলানা আজাদকে ঘিরে এমন কিছু অনৈতিহাসিক আলাপ-আলোচনা উঠে আসে, যা কেবল বিকৃত ইতিহাসই নয়, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের প্রশ্নেও একটি অত্যন্ত নেতিবাচক অধ্যায়। সুভাষচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা আনুগত্য প্রকাশের ভেতর দিয়ে এক ধরনের বাঙালি শ্যভিনিজমকে চাগিয়ে তুলে, মওলানা আজাদকে গান্ধীজীর গোড়া সমর্থক হিসেবে উপস্থাপিত করে, হিন্দু -মুসলমানের মধ্যে এক ধরনের বিবাদ-সংঘাতের অভিপ্রায় তৈরি করার চেষ্টা করা হয়।

বসু ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের ব্যবস্থা গ্রহণ করবার পর ১৯৪০ সালের ২৩শে ডিসেম্বর গান্ধীজীকে একটি চিঠি লিখেছিলেন সুভাষচন্দ্র। সেই চিঠির জবাবে গান্ধীজী ২৯শে ডিসেম্বরের চিঠিতে সুভাষকে প্রথমেই লেখেন; ইউ আর ইরেসপনসেবল হোয়েদার ইল অর ওয়েল। সেই চিঠিতে গান্ধীজি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে লিখেছিলেন; আই হ্যাভ নট বিন ইন কনসালটেশন উইথ মওলানা সাহেব। সেখানে গান্ধীজী আরও লেখেন; বাট হোয়েন আই রিড ইন দি পেপার এবাউট দি ডিসিশন আই কুড নট হেলপ অ্যাপ্রুভিং অফ ইট। আই অ্যাম সারপ্রাইজড দ্যাট ইউ ওন্ট ডিস্টিঙ্গুইস বিটুইন ডিসিপ্লিন এন্ড ইনডিসিপ্লিন।

তাই গান্ধীজী এবং সুভাষচন্দ্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টিকে অন্ধ ভাবাবেগের দৃষ্টিভঙ্গির ভেতর দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ না করে, সমসাময়িক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে, অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে আমাদের বিচার করে দেখা দরকার। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়, সুভাষচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের তাগিদ থেকে যেমন অনৈতিহাসিক ভাবে গান্ধীজীর মূল্যায়ন করার একটা প্রবণতা বাঙালি সমাজের মধ্যে রয়েছে, তেমনিই পণ্ডিত নেহরু সম্পর্কে অনৈতিহাসিক মূল্যায়ন করার একটা প্রবণতাও বাঙালি সমাজের ভেতরে রয়েছে।

এই প্রবণতা বৃদ্ধিতে সুভাষচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত দল ফরওয়ার্ড ব্লক, শুরু করলেও যাকে পরবর্তীকালে সেভাবে গুরুত্ব দেওয়ার কোন পথেই সুভাষচন্দ্র আর হাঁটেন নি, সেই দলটিও অত্যন্ত বড় রকম অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে এসেছে। বস্তুত রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা যেভাবে হিন্দুত্বকে তাদের রাজনৈতিক মূলধন হিসেবে ব্যবহার করে, নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করে থাকে, ঠিক তেমনভাবেই, ফরওয়ার্ড ব্লক সুভাষচন্দ্রকে তাদের রাজনৈতিক মূলধন হিসেবে ব্যবহার করে গান্ধী এবং পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে বিরোধিতাকে একটি প্রধান উপজীব্য হিসেবে তুলে ধরে নিজেদের রাজনৈতিক ডিভিডেন্ড পাওয়ার চেষ্টা করেছে।

ক্ষমতার রাজনীতির এই পারস্পরিক টানাপোড়েনের দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে গিয়ে, এই ইতিহাস পুরুষদের সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ একান্ত জরুরি।

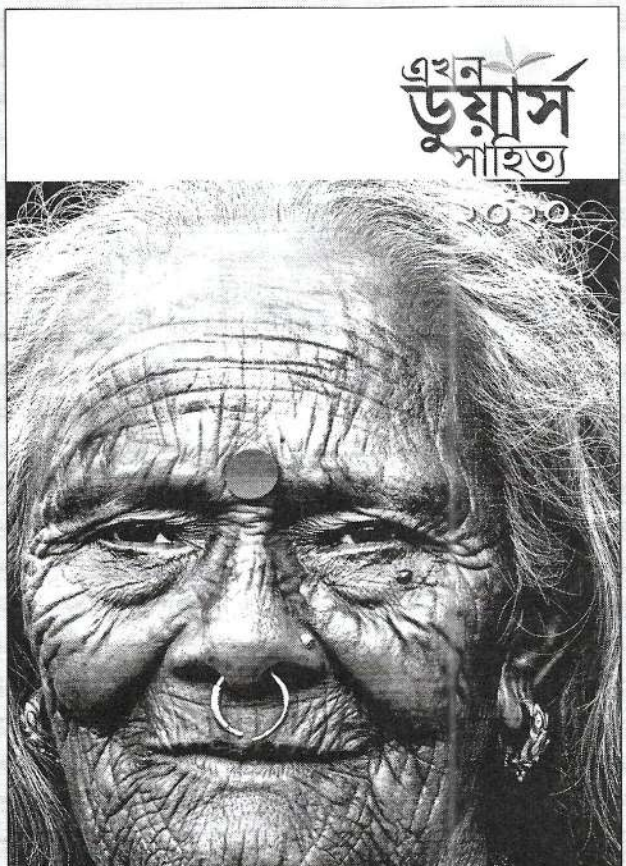

এ সময়ে বাংলার উত্তরে সাহিত্যচর্চার সেরা সংকলন

উপন্যাস

বিপুল দাস। তনুশ্রী পাল। অমিত কুমার দে। শুভময় সরকার। অভিজিৎ সরকার। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

গল্প

পীযুষ ভট্টাচার্য। অর্ণব সেন। অরুণাভ ভৌমিক। বিমল লামা। দিবাকর ভট্টাচার্য। গৌতমেন্দু রায়। তপতী বাগচি। সাগরিকা রায়। কল্যাণ গোস্বামী। রাজর্ষি চট্টোপাধ্যায়। সুচন্দ্রা ভট্টাচার্য। দীপালোক ভট্টাচার্য। শাশ্বতী চন্দ। রম্যাণী গোস্বামী। সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়। শ্বেতা সরখেল। রাখি পুরকায়স্থ। দেবপ্রিয়া সরকার। মানিক সাহা। রঙ্গন রায়। সন্দীপন নন্দী। সত্যম ভট্টাচার্য। সৌমিত্র চৌধুরী। সুব্রত চক্রবর্তী। শাঁওলি দে। হিমি মিত্র রায়। সৌগত ভট্টাচার্য। শতরূপা নাগপাল। ইপ্সিতা সোম। অগ্রদীপ দত্ত।

কবিতা

তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত কবিতা। সন্তোষ সিংহের রাজবংশী কবিতাগুচ্ছ। সমীর চট্টোপাধ্যায়। অমর চক্রবর্তী। কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য। সমর রায়চৌধুরী। রাণা সরকার। বিজয় দে।

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস। সুজিত দাস। নিখিলেশ রায়। অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়। রত্নদীপা দে ঘোষ। সেবন্তী ঘোষ। অনিন্দিতা গুপ্ত রায়। সোমা বৈদ্য। সুদীপ্ত মাজি। সুবীর সরকার। নিঝুম ঠাকুর। অমিত দে। জয়শীলা গুহ বাগচী। মনোনীতা চক্রবর্তী। সৌমনা দাশগুপ্ত। স্বপ্ননীল রুদ্র।

শ্যামলী সেনগুপ্ত। শুক্লা রায়। সম্পা দত্ত দে। পাপড়ি গুহ নিয়োগী। সৌম্য সরকার। নীলাদ্রি দেব। মারুফ আহমেদ নয়ন। নির্মাল্য ঘোষ। অনুপ ঘোষাল। অভিজিৎ দাশ। দীপায়ন পাঠক। শক্তিপ্রসাদ ঘোষ। সুপ্রিয় চন্দ। প্রশান্ত নাথ চৌধুরী। অমিত পাল। হেমন্ত সরখেল। তুহিন শুভ্র মন্ডল। জ্যোতির্ময় মুখার্জি। তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস। মহুয়া। সন্দীপ শর্মা।

পরিবেশক ও প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি। বিশ্বাস বুক এজেন্সি, বাটা গলি, হিলকার্ট রোড ৯৪৩৪৩২৭৩৪২ **জলপাইগুড়ি।** ভবতোষ ভৌমিক, কমার্স কলেজের বিপরীতে ৯৭৩৩২৪৬৯১৩ **আলিপুরদুয়ার।** দীপক কুমার হোড়, কলেজ হল্ট ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭ **কোচবিহার।** জয়ন্ত দাস, বড় পোস্ট অফিসের বিপরীতে ৯৪৩৪২১৭০৮৪ **মালদা।** অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি ৭৮৬৪৯৯৫৫১৫ **কলকাতা।** বিশাল বুক সেন্টার, ৪ টৌটি লেন, নিউ মার্কেট। ৪০৬৪৪০৯৭ অথবা না পেলে যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে ৯৮৩০৪১০৮০৮।

সম্পাদক শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ৫১২ পৃষ্ঠার পেপারব্যাক। মূল্য ১৯৫ টাকা

বড়ো শান্তি চুক্তি কতটা শান্তি বয়ে আনবে তা সময়ই বলবে

সমর দেব

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে বড়ো শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত। ছবিঃ টুইটার থেকে সংগৃহীত।

আবসু, এনডিএফবি এবং অসম সরকারের সঙ্গে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাক্ষরিত হয়েছে ২০২০ সালের বড়ো শান্তি চুক্তি। তার পরপরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অসমের বড়ো অঞ্চলের জন্য ১৫০০ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হবার পরপরই কোকরাঝাড়ে অনুষ্ঠিত এক জনসমাবেশে প্রধানমন্ত্রী ওই প্যাকেজের কথা ঘোষণা করে আশা প্রকাশ করেছেন যে, এবারে কয়েক দশকের পুরনো বড়ো সমস্যার সমাধান হবে। ফলে, শান্তি ও প্রগতির এক নতুন যুগের সূচনা হবে। বড়ো অঞ্চলের পরিকাঠামো এবং উন্নয়নমূলক কাজে এই অর্থ কাজে লাগবে। কর্ম নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এই চুক্তিতে বড়ো জনগোষ্ঠী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভবান হবে। সুরক্ষিত হবে বড়ো ভাষা, সংস্কৃতিও।

এসবই অত্যন্ত জরুরি ছিল। বড়ো জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা এবং বড়ো জনগণের অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা জরুরি বিষয়। অনেক আগেই এসব হওয়া উচিত ছিল। নানা কারণে বড়ো অঞ্চলটি অত্যন্ত পশ্চাদপদ। সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থাও মোটেই আশানুরূপ নয়। ফলে এই অঞ্চল এবং বড়ো জনগোষ্ঠীর বিকাশে সরকারি উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসনীয়। তবে, না আচালে বিশ্বাস নেই। সেই সঙ্গে বড়োল্যান্ড অঞ্চলটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। ওই অঞ্চলে বড়ো জনগোষ্ঠী ছাড়াও রয়েছেন বাঙালি হিন্দু ও মুসলিম, সাঁওতাল, রাভা, কোচ-রাজবংশী, মেচ এবং গোর্খা জনগোষ্ঠীও। সেক্ষেত্রে বড়ো জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে বড়ো সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে শান্তি চুক্তির অন্য পিঠে থাকছে বাকি জনগোষ্ঠীর স্বার্থের প্রশ্নটিও। দীর্ঘকাল ধরে বড়ো অঞ্চলে বাঙালি মুসলিম এবং বড়ো জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক হিংসা ঘটেছে। বহু মানুষের প্রাণহানিও ঘটেছে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেবার মতো ঘটনাও দেখা গেছে। শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে সংশ্লিষ্ট এলাকায় অন্য জনগোষ্ঠীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষ করে জমির অধিকার থেকে শুরু করে মৌলিক সাংবিধানিক অধিকারগুলি কতটা রক্ষিত হবে সেটা কোটি টাকার প্রশ্ন।

আবসু, এনডিএফবি এবং অসম সরকারের মধ্যে সম্প্রতি স্বাক্ষরিত হয়েছে ২০২০ সালের বড়ো শান্তি চুক্তি। তার পরপরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অসমের বড়ো অঞ্চলের জন্য ১৫০০ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন।

নিম্ন অসমের বড়োল্যান্ড অঞ্চল নয়ের দশকে বহু হিংসা দেখেছে। ১৯৭৯-১৯৮৫ সময়কালের ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনে তেমন ভয়ানক হিংসা দেখা যায়নি বড়ো অধ্যুষিত অঞ্চলে। ওই আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটেছিল ১৯৮৫ সালে স্বাক্ষরিত অসম চুক্তির মাধ্যমে। সেবার অসম বিধানসভার নির্বাচনে বিপুল ভোটে জিতে রাজ্যের ক্ষমতায় এসেছিল আন্দোলনকারীদের উদ্যোগে নবগঠিত দল অসম গণ পরিষদ (অগপ)। অল আসাম স্টুডেন্টস ইউনিয়নের (আসু) নেতৃত্বে ঐতিহাসিক অসম আন্দোলন তথা বহুকথিত বিদেশী খেদা আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ শরিক ছিল অল বড়ো স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (আবসু)। ১৯৮৫ সালের নির্বাচনে বিপুল ভোটে ক্ষমতাসীন হবার পর আসু নেতা প্রফুল্লকুমার মহন্ত মুখ্যমন্ত্রী হন। তৎকালীন আসুর দ্বিতীয় স্থলাধিকারী নেতা ভৃগুকুমার ফুকন হন রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেই সময়ে সংগঠনের সভাপতি উপেন ব্রহ্মের নেতৃত্বে আবসুর একটি প্রতিনিধিদল দিসপুরে এসে সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে

বড়োল্যান্ড অঞ্চলটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। ওই অঞ্চলে বড়ো জনগোষ্ঠী ছাড়াও রয়েছেন বাঙালি হিন্দু ও মুসলিম, সাঁওতাল, রাভা, কোচ-রাজবংশী, মেচ এবং গোর্খা জনগোষ্ঠীও। সেক্ষেত্রে বড়ো জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে বড়ো সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে শান্তি চুক্তির অন্য পিঠে থাকছে বাকি জনগোষ্ঠীর স্বার্থের প্রশ্নটিও। দীর্ঘকাল ধরে বড়ো অঞ্চলে বাঙালি মুসলিম এবং বড়ো জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক হিংসা ঘটেছে। বহু মানুষের প্রাণহানিও ঘটেছে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেবার মতো ঘটনাও দেখা গেছে। শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে সংশ্লিষ্ট এলাকায় অন্য জনগোষ্ঠীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে।

আলোচনায় আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। আবসুর নিজস্ব দাবিদাওয়া নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে চেয়েছিলেন সংগঠনের নেতারা। কিন্তু সেই আলোচনায় রাজি হয়নি মহন্ত সরকার। বাস্তবিকই উপেন ব্রহ্মের নেতৃত্বে আগত প্রতিনিধি দলটিকে ফিরিয়েই দেওয়া হয়। এঘটনায় তীব্র অপমানিত বড়ো সংগঠনের নেতারা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বড়ো জনমনে এমন ধারণার জন্ম হয় যে, 'অসমিয়া জাতীয়তাবাদ' তাদের সমস্যা সমাধানে মোটেই আগ্রহী নয়। ওই ঘটনার পর থেকেই 'অসমিয়া' জাতীয়বাদ থেকে বড়ো জনগোষ্ঠীর

মানসিক বিচ্ছেদ ঘটতে থাকে এবং তারা পৃথকভাবে আন্দোলনে নামে। তারপর নয়ের দশক জুড়ে একাধিক বড়ো সংগঠনের জন্ম হয় এবং শুরু হয়ে যায় বড়ো জাতিসত্তার আত্মরক্ষার আন্দোলন। একাংশ ঝুঁকে পড়ে সন্ত্রাসবাদের বিপজ্জনক পথে। শুরু হয় তীব্র সংগ্রাম। বলাই বাহুল্য যে, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন রক্তাক্ত হয়ে ওঠে বড়োল্যান্ড অঞ্চল। সন্ত্রাসবাদীদের হিংসার বলি হয় শত শত মানুষ। উল্লেখ্য, বড়ো সন্ত্রাসবাদের প্রতিক্রিয়ায় পাল্টা হিংসার জন্ম হলে প্রায় গৃহযুদ্ধের চেহারা নেয় বড়োভূমি। সংখ্যালঘু মুসলিমদের একাংশ পাল্টা জঙ্গি সংগঠনের জন্ম দেয় এবং বড়ো গ্রামগুলিতে হিংসাত্মক আক্রমণে নামে। প্রায় এক দশক ধরে চলতেই থাকে হিংসা আর পাল্টা হিংসা। নতুন শতকে এসে হিংসা খানিকটা প্রশমিত হলেও ২০০৮ সালের ৩০ অক্টোবর রাজ্য জুড়ে ভয়াবহ ধারাবাহিক বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। বড়ো সন্ত্রাসবাদীদের ওই ধারাবাহিক বিস্ফোরণে একদিনে সামান্য সময়ের ব্যবধানে প্রায় একশো মানুষের প্রাণহানি ঘটে। প্রায় পাঁচশো মানুষ আহত হন। ওই প্রেক্ষিতে প্রশাসন কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে। পরবর্তীতে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর বহু নেতা গ্রেফতার হন। তারপরও একাধিক বড়ো জঙ্গি সংগঠনের চোরাগোপ্তা হিংসাত্মক কার্যকলাপ চলতেই থাকে। একই সঙ্গে চলতে থাকে ধরপাকড়ও। তবে, ব্যাপক হিংসার মতো পরিস্থিতি আর দেখা যায় নি। অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর মতো একাধিক বড়ো সংগঠনও আলোচনায় আগ্রহী হয়ে ওঠে। আলফা সহ অধিকাংশ সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর কার্যকলাপ স্তিমিত হয়ে আসে।

গত বিধানসভা নির্বাচনের সময়ে দেখা যায় একদা আসুর নেতারা দলে দলে বিজেপিতে ভিড়তে থাকেন। ছাত্র সংগঠন আসু থেকে অগপ-য় এবং সেখান থেকে বিজেপিতে নেতাদের যোগদানের প্রেক্ষিতে প্রশ্ন ওঠে, আঞ্চলিক দল অগপ-র জন্ম হয়েছিল স্থানীয় স্বার্থরক্ষার স্বার্থেই, তাহলে আঞ্চলিক নেতারা কেন জাতীয় দল বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন? জাতীয় দল বিজেপি রাজ্যের স্থানীয় আশা আকাঙ্ক্ষা আদৌ পূরণে আগ্রহী অথবা সক্ষম কিনা। এই প্রেক্ষিতে অগপ থেকে বিজেপিতে যোগ দেওয়া চন্দ্রমোহন পাটোয়ারির সুস্পষ্ট জবাব ছিল আসু বা অগপর সঙ্গে বিজেপির বিরোধের জায়গা নেই। কারণ, আটের দশকে আসুর আন্দোলনে সমর্থন ছিল বিজেপির। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী সহ অনেক নেতারই পরামর্শ পেয়েছিলেন তৎকালীন আসু নেতারা। তাহলে কি এমন মনে করার যথেষ্ট কারণ থাকে যে, আসুর তৎকালীন আন্দোলন পেছন থেকে পরিচালিত হয়েছিল বিজেপির দ্বারাই? অসম আন্দোলনের একটি পর্যায়ে ১৯৮৩ সালে নেলি গণহত্যার ঘটনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে কি? নেলি গণহত্যাকাণ্ডে বেসরকারি হিসেবে হাজার দশেক মানুষ মারা পড়েছিল, যারা অধিকাংশই ইসলাম ধর্মাবলম্বী। তবে, সরকারি হিসেবে নিহতের সংখ্যা অনেক কম। তবু, সরকারি প্রচেষ্টা এবং অসংখ্য মানুষের সক্রিয়তায় অসমের পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হয়েছে। তুলনামূলকভাবে সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ফের উন্নয়নের পথে হাঁটতে শুরু করে রাজ্যটি। তবে, আসুর আন্দোলনের পর অগপ দুবার ক্ষমতাসীন হলেও বিদেশী নাগরিক সংশ্লিষ্ট সমস্যাটির নিষ্পত্তি সম্ভব হয় নি।

কাজ শুরু করেছিল কংগ্রেস সরকারই। প্রাথমিক পর্যায়ে বরপেটা জেলায় এনআরসির কাজ প্রবল প্রতিবাদের মুখে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পরে রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর সুপ্রিমকোর্টের মধ্যস্থতায় শুরু হয় এনআরসির নবায়ন প্রক্রিয়া। প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে যে এনআরসি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে তাতে বাদ পড়েছে প্রায় উনিশ লক্ষ মানুষের নাম। দীর্ঘকাল ধরে অসমের প্রায় সব দল ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীই বলে আসছে বাঙালি মুসলমানরাই অনুপ্রবেশকারী, অবৈধ নাগরিক। বাস্তবে এনআরসি প্রক্রিয়ায় জালে পড়েছে যারা তাদের অধিকাংশই কিন্তু বাঙালি হিন্দু। বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান থেকে হিন্দু সহ কয়েকটি সম্প্রদায়ের প্রতি উদারতা দেখিয়ে ঘোষণা করেছে যে, এসব দেশ থেকে ধর্মীয় নিপীড়ন ও নির্যাতনের বলি হিন্দু সহ কয়েকটি ধর্মীয় পরিচয়ের মানুষ ভারতে এলে তাদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। এনিয়ে একদিকে সারা দেশে আপত্তি উঠেছে যে, এভাবে সংবিধানের মূল কাঠামোকে আঘাত করা হচ্ছে। অন্যদিকে, অসমে আপত্তি উঠেছে যে, এভাবে বাংলাদেশী নাগরিকদের বৈধতা দেওয়া হচ্ছে। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন পাশ করে কেন্দ্র এমনকি, অসম চুক্তিও লঙ্ঘন করেছে। অসম চুক্তিতে মেনে নেওয়া হয়েছে যে, ১৯৭১ সাল অবধি আগতদের নাগরিকত্ব মেনে নেওয়া হবে। কিন্তু সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনে ২০১৪ সালকে নাগরিকত্বের ভিত্তিবর্ষ ধরা হয়েছে। ফলে, কয়েক দশক ধরে অসমে যে মূল সমস্যার প্রেক্ষিতে আন্দোলন চলেছে, অসমিয়া ভাষা-সংস্কৃতি বিপন্ন এবং এই বিপন্নতা থেকে রক্ষা পেতেই আন্দোলনের জেরে ১৯৮৫ সালের ঐতিহাসিক অসম চুক্তি। সেই চুক্তি অনুযায়ী ১৯৭১ সাল অবধি আগতদের সবাইকেই নাগরিক বলে স্বীকার করা হবে। ফলে অসমিয়া জনগোষ্ঠীর পক্ষে নতুন আইনটি মেনে নেওয়া কার্যত অসম্ভব। এই পরিস্থিতিতে নতুন আইনটির ভবিষ্যৎ কার্যত ঝুলে রয়েছে। আর, এনআরসি তালিকা থেকে বাদ পড়া উনিশ লক্ষের মধ্যে প্রায় বারো লক্ষ বাঙালি হিন্দু রয়েছে, যেটা বিজেপির পক্ষে বিপজ্জনক। বিশেষ করে বাঙালি হিন্দু জনগোষ্ঠী অসমে বিজেপির বিরাট সাপোর্ট বেস। এই বিপুল পরিমাণ ভোট স্বভাবতই হারাতে চাইবে না তারা। ফলে, এনআরসির ভবিষ্যৎ কী হবে কেউ জানে না। তারচেয়ে বড় কথা নতুন করে হয়তো এক বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করা হলো।

এই পশ্চাৎপটেই দেখতে হবে সাম্প্রতিক বড়ো শান্তি চুক্তি। শেষ অবধি শান্তি কতটা প্রতিষ্ঠিত হবে সেটা সময়ই বলবে। কিন্তু বড়োল্যান্ড অঞ্চলে বসবাসকারী অন্যান্য জনগোষ্ঠীর পক্ষে সেটা শান্তির কারণ নাও হতে পারে। বিশেষ করে সাধারণ মানুষের পেটে টান পড়লে শান্তিভঙ্গের প্রবল আশঙ্কা। কে বলতে পারে বড়োল্যান্ড অঞ্চলে ফের নতুন করে জটিলতার সৃষ্টি করা হলো কিনা।

বড়োল্যান্ড অঞ্চলে বহুবার জনগোষ্ঠীগত হিংসা দেখা গেছে। নয়ের দশকের এরকম এক হিংসাত্মক ঘটনায় গ্রাম জ্বালিয়ে দেবার পরদিনের ছবি।

অসম চুক্তিতে মেনে নেওয়া হয়েছে যে, ১৯৭১ সাল অবধি আগতদের নাগরিকত্ব মেনে নেওয়া হবে। কিন্তু সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনে ২০১৪ সালকে নাগরিকত্বের ভিত্তিবর্ষ ধরা হয়েছে। ফলে, কয়েক দশক ধরে অসমে যে মূল সমস্যার প্রেক্ষিতে আন্দোলন চলেছে, অসমিয়া ভাষা-সংস্কৃতি বিপন্ন এবং এই বিপন্নতা থেকে রক্ষা পেতেই আন্দোলনের জেরে ১৯৮৫ সালের ঐতিহাসিক অসম চুক্তি। সেই চুক্তি অনুযায়ী ১৯৭১ সাল অবধি আগতদের সবাইকেই নাগরিক বলে স্বীকার করা হবে। ফলে অসমিয়া জনগোষ্ঠীর পক্ষে নতুন আইনটি মেনে নেওয়া কার্যত অসম্ভব। আর, এনআরসি তালিকা থেকে বাদ পড়া উনিশ লক্ষের মধ্যে প্রায় বারো লক্ষ বাঙালি হিন্দু রয়েছে, যেটা বিজেপির পক্ষে বিপজ্জনক।

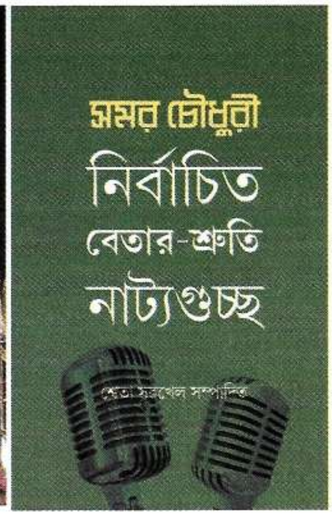

প্রকাশিত হল বহু আকাঙ্খিত সমর চৌধুরীর নির্বাচিত কুড়িটি বেতার শ্রুতি নাটক।

বেতার ও শ্রুতি নাটকে উত্তরের এক জনপ্রিয় নাম সমর চৌধুরী। মানুষ হিসেবেও তাঁর পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা ছিল অবিসংবাদিত। তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ মিলল ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ২০২০ জলপাইগুড়ির রবীন্দ্রভবন মঞ্চে। এদিন সন্ধ্যায় 'এখন ডুয়ার্স'-এর উদ্যোগে প্রকাশিত হল সমর চৌধুরীর নির্বাচিত নাট্যগুচ্ছ। সম্পাদনায় অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন সমর-কন্যা শ্বেতা সরখেল। তার থেকে দুটি নাটকের উপস্থাপনা করলেন জগন্নাথ ও ঊর্মিমালা বসু। ওঁরা দুজনেই সমর চৌধুরীর অত্যন্ত কাছের মানুষ ছিলেন।

সৃষ্টি মাইম থিয়েটারের দশ বছর পূর্তিতে মূকাভিনয় নিয়ে বাংলা বই

বেতার ও শ্রুতি নাটকের পর মূকাভিনয় নিয়ে সৃষ্টি মাইম প্রযোজিত বই 'বাঙ্ময়' প্রকাশ করল 'এখন ডুয়ার্স'। ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ জলপাইগুড়ি রবীন্দ্রভবন মঞ্চে বইটি প্রকাশ করলেন পদ্মশ্রী নিরঞ্জন গোস্বামী ও সংগীত নাটক একাডেমির প্রাক্তন ডিরেক্টর ড. ওমপ্রকাশ ভারতী ও জলপাইগুড়ির বিশিষ্ট নাট্যকর্মীরা।

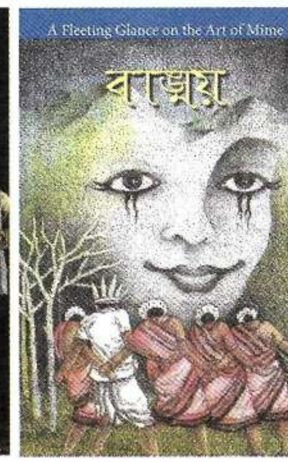

শান্তিময় রায়

শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়

মূকাভিনয় নিয়ে বাংলা বই দুর্লভ এবং বইটির প্রকাশ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বইটির সম্পাদনা করেছেন জলপাইগুড়ি সৃষ্টি মাইম থিয়েটারের কর্ণধার সব্যসাচী দত্ত। একটি মনোজ্ঞ মূকাভিনয় সন্ধ্যা দর্শকদের উপহার দিলেন সৃষ্টি মাইম। আয়োজকদের নিজস্ব শিল্পীরা ছাড়াও অসাধারণ উপস্থাপনায় দর্শকের মন কাড়লেন কলকাতার শান্তিময় রায় ও শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়। সমর চৌধুরী এবং মূকাভিনয় সম্পর্কে নতুন প্রজন্মের উৎসাহ ও আস্থা বাড়াবার উদ্দেশ্যেই এই বই দুটির প্রকাশ।

সমর চৌধুরী নির্বাচিত বেতার-শ্রুতি নাট্যগুচ্ছ, শ্বেতা সরখেল সম্পাদিত। ৫১২ পৃষ্ঠার পেপার ব্যাক ২৪৫ টাকা। **বাঙ্ময়** A Fleeting Glance on the Art of Mime, সব্যসাচী দত্ত সম্পাদিত। ১৬৮ পৃষ্ঠার পেপার ব্যাক ১২৫ টাকা।

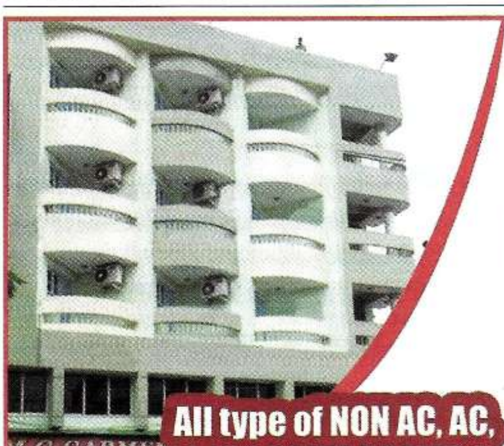

WEL COME
HOTEL YUBRAJ
&
RESTAURANT MONARCH
CHARU ARCADE | B. S. ROAD | COOCHBEHAR
CONTACT NO.
+91 9735526252, (03582) 227885
Email: hotelyubrajcoochbehar@gmail.com
www.hotelyubrajcoochbehar.com

রাজনগরের রাজনীতি

(৩)

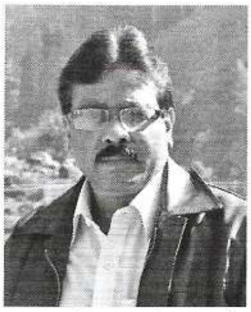

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

ষাটের দশক ছিল কমল গুহ তথা ফরওয়ার্ড ব্লকের উত্থানকাল

একান্নর খাদ্য আন্দোলনে পঞ্চ শহীদের বলিদানের ঠিক দশ বছর পর একষট্টিতে অমর সার্কাসের জিপের তলায় ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় শান্ত স্নিগ্ধ কোচবিহার আবার দাবানলের মত জ্বলে উঠল। পড়াশোনা পরীক্ষা সব মাথায় উঠল। ছাত্রটির মৃত্যুর পরদিন শহরের প্রায় সমস্ত স্কুল কলেজ থেকে হাজার হাজার উত্তেজিত ছাত্র মেলার মাঠে সার্কাসের তাবু ঘিরে ধরল। ইট লাঠি যে যা পেল তাই নিয়ে ছুটে গেল বদলা নিতে। গালাগালি উত্তেজনা থেকে শুরু হলো ইট বৃষ্টি। স্বতস্ফূর্ত তীব্র ছাত্র বিক্ষোভের জেরে সার্কাসের বীর পালোয়ানদের প্রতিরোধ কিছুক্ষণের মধ্যেই তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ল। থানা থেকে দু এক গাড়ি পুলিশ এসে ওই প্রচণ্ড ছাত্র বিক্ষোভ সামাল দিতে হিমসিম খেয়ে গেল। ভ্যানে করে পেছনের দিক দিয়ে প্রথমে মহিলা খেলোয়াড়দের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌছে দিয়ে এল পুলিশ। এর পর লাইন থেকে প্রচুর পুলিশ জড় হল সার্কাসের প্যাণ্ডেলে। বিক্ষোভ বেড়েই চলল। পুলিশের গাড়িতে মাইক বেঁধে গোটা শহরে ১৪৪ ধারা জারি হল। মেলা ভেঙে গেল। শান্তিপ্রিয় মানুষজন ঘর বন্দী।

বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো এই ছাত্র বিক্ষোভে সামিল হয়ে গেল। আমার বেশ মনে আছে আমাদের (জেনকিন্স) স্কুলের দাপুটে হেডমাষ্টার কালীপদ মুখার্জীর নির্দেশে স্কুলের সমস্ত গেটগুলো আটকে প্রতিটি গেটে মাষ্টারমশাইরা দাঁড়িয়ে গেলেন। একজন ছাত্রকেও স্কুল থেকে বের হতে দেওয়া হল না। বেলা নামতেই এক এক করে সবাইকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তবুও উঁচু ক্লাসের কিছু দলছুট বেপরোয়া ছাত্র সার্কাসের প্যাণ্ডেলে ছুটে গিয়েছিল প্রতিবাদ জানাতে। যাইহোক ১৪৪ ধারা ঘোষণা আর পুলিশি সাবধান বাণী প্রতিবাদীদের ঘরে আটকে রাখতে পারল না। সন্ধ্যের পর থেকে হাজার হাজার মানুষের উন্মত্ত বিক্ষোভে উদ্বেল হয়ে উঠল গোটা রাসমেলা চত্বর। তখন আর নিছক ছাত্র বিক্ষোভ নয়, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী সমর্থক আর সমাজ বিরোধীরাও মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে ওই হিংসাত্মক আন্দোলনে। জ্বলন্ত মশাল ছুড়ে সার্কাসের তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। পুড়ে ছাই হয়ে গেল অমর সার্কাসের বিশাল প্যান্ডেল। বিমান বন্দরের একমাত্র অগ্নি নির্বাপনের গাড়িটিকে জেলখানার মোড়ে ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হল। সার্কাস দলের কর্মকর্তাদের খোঁজে গোটা শহর তোলপাড়।

এরই মধ্যে গুজব রটে গেল অমর সার্কাসের বাঘ খাঁচা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। নিরীহ মানুষ দরজায় খিল এঁটে দিলেন। আন্দোলকরা কিন্তু এতেও দমার পাত্র নয়! আমাদের পাড়ার ভোলা মুস্তাফির বাড়ির দোতলায় সার্কাস দলের মহিলা সদস্যদের লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। সেখানেও হামলা চলল। জমিদার বাড়ির দরজা, জানলার কাচ বিক্ষোভকারিদের ছোড়া ইঁটের আঘাতে ভেঙে চৌচির। সেখান থেকে রাতের অন্ধকারে সার্কাসের কুশিলবদের আলিপুরদুয়ার রেল স্টেশনে পৌছে দিল পুলিশ। বিক্ষোভ কিন্তু প্রশমিত হল না। পুলিশের লাঠি, টিয়ার গ্যাস কোনও কিছুতেই আর বিক্ষোভকারিদের বাগে আনা গেল না। ধীরে ধীরে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে গেল। পরদিন সাত সকালেই শহরে কারফিউ জারি হয়ে গেল। প্রথমে ফ্ল্যাগ মার্চ। তার পর কালো গাড়িতে চেপে উন্মুক্ত স্টেনগান, রাইফেল তাক করে লাল টুপি পড়া ইয়া গোঁফওয়ালা তাগড়াই পুলিশের দল গোটা শহর দাপিয়ে বেড়াতে লাগল। এদিক ওদিক থেকে পুলিশের গাড়িতে চোরাগোপ্তা দু একটা ঢিল এসে পড়তেই উন্মত্ত পুলিশ কাছে পিঠে যাকে পেল তাকেই লাঠি পেটা করতে শুরু করলো। রাতের বেলা গোটা শহর প্রায় ব্ল্যাক আউটের চেহারা নিল। বিশ্বসিংহ রোডে ধর্মসভার সামনে ডিস্পেন্সারী বন্ধ করে রাতে বাড়ি ফিরছিলেন বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক সত্য ডাক্তার। লাঠি নিয়ে পুলিশ চড়াও হল তাঁর উপর। পুলিশের লাঠির আঘাতে আহত হলেন তিনি। বেচারা মণি কম্পাউণ্ডার ইঞ্জেকশন দিয়ে সাইকেলে চেপে রাতে বাড়ি ফিরছিলেন। হরিশপাল চৌপথিতে তাঁকে সাইকেল থেকে নামিয়ে বেধড়ক মার দিল পুলিশ। জখম হয়ে সদর হাসপাতালে ভর্তি হলেন তিনি।

পুলিশি নির্যাতন চলতেই লাগল। বহু নিরপরাধ মানুষ পুলিশি হেনস্তার শিকার হলেন। পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে গা ঢাকা দিলেন তখনকার আন্দোলক ফরওয়ার্ড ব্লকের যুব নেতা দিলীপ রায় (কাতু দা), মহাদেব ঘোষ (ডিঙা দা), আলম মিয়া আর দলের নির্দেশ না মানা কংগ্রেসের ভুটিয়া ভলেন্টিয়ার প্রদীপ দা, নির্মল (দনু) দা এবং তখনকার মস্তান ভাগিরথী পান্ডেরা। তবে কেস খেলেন সবাই। মানুষের ক্ষোভ তুষের আগুনের মত ধিকি ধিকি করে জ্বলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত গোটা ঘটনায় রাজনৈতিক রঙ চড়ে গেল। সাধারণ মানুষের সব রাগ গিয়ে পড়ল ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকারের উপর। অসম থেকে বাঙালি হিন্দু বিতারণের প্রেক্ষিতে এমনিতেই এ জেলার মানুষ কংগ্রেস বিরোধী হয়ে পড়েছিল। এরপর পাকিস্তানকে বেরুবাড়ি হস্তান্তরের উদ্যোগের প্রতিবাদে সংগঠিত গণআন্দোলনে ফরওয়ার্ডব্লক এই জেলায় কংগ্রেসকে আরও কোণঠাসা করে ফেলল। গ্রামেগঞ্জে তখন আকাশ বাতাস উতপ্ত করা স্লোগান ছিল 'রক্ত দেব প্রাণ দেব বেরুবাড়ি ছাড়ব না'। সদ্য ভিটে মাটি হারানো পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের মধ্যে এই স্লোগান দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল। পাশাপাশি নতুন করে উদ্বাস্তু হওয়ার ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন স্থানীয় মানুষজন। মেঘ না চাইতেই জল পাওয়ার মত অমর সার্কাসকে ঘিরে গড়ে ওঠা গণরোষ ছিল বামপন্থীদের কাছে পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা!

৬২ সালের নির্বাচনে গোটা জেলায় কংগ্রেসের ভরাডুবি হল। একমাত্র মাথাভাঙ্গা কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী মহেন্দ্র ডাকুয়া ছাড়া গোটা জেলার সবগুলো আসনেই বামপন্থীরা জয়ী হলেন সেবার। কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে (কোচবিহার শহর সহ) জয়ী হলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের সুনীল (মান্টু) দাশগুপ্ত, দিনহাটায় কমল গুহ, সিতাইতে বিজয় রায়, পশ্চিমে সুনীল বাসুনিয়া, মেখলিগঞ্জে অমর রায় প্রধান আর তুফানগঞ্জ আসনে জয়ী হলেন অবিভক্ত কমিউনিষ্ট দলের প্রার্থী জীবনকৃষ্ণ দে। লোকসভায় জয়ী হলেন ফরওয়ার্ডব্লকের দেবেন্দ্রনাথ কার্জি। কোচবিহার শহরময় বাজি পটকা ফাটল। আনন্দে উদ্বেল হয়ে সত্য ডাক্তার মানুষকে ডেকে ডেকে রসগোল্লা খাওয়ালেন।

১৯৬২-র অক্টোবরে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। চীন ভারত আক্রমণ করল। যুদ্ধ ব্যাপারটা নিয়ে তখন ভয়ের থেকে থ্রিলটাই বেশি ছিল আমাদের মতো অবুঝ কিশোর মনে! প্রতিপক্ষের বিমান আক্রমণ থেকে বাঁচতে গোটা শহর জুড়ে জানলার কাঁচে আঠা দিয়ে কাগজের কাটাকুটি (cross) সেটে দেওয়া হল। গাড়ির হেডলাইটের উপরের দিকটা কালো রঙ দিয়ে ঢেকে দেওয়া শুরু হল। আর রাস্তার বৈদ্যুতিক বাতিগুলোতে একটা করে গেলাস উল্টো করে ঝুলিয়ে দিয়ে আলোর বিচ্ছুরণ বন্ধ করে দেওয়া হল। সন্ধে নামতেই বাড়ি ঘরের দরজায় খিল। সবাই বলল এটাকে নাকি বলে 'ব্ল্যাক আউট'। মাঝেই মাঝেই সাইরেন বাজত। বিপদ সঙ্কেতে ঘন ঘন সাইরেন বাজতো। আর বিপদ কেটে গেলেই একটানা অল ক্লিয়ার সাইরেন। যাইহোক, দেশ তখন গভীর সঙ্কটে। জহরলাল নেহরু তখন প্রধানমন্ত্রী। গঠিত হল জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিল। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী মোরারজি দেশাই এলেন কোচবিহারে। লাইনের (রাস মেলা) মাঠে মঞ্চ তৈরি হল। হাজার হাজার মানুষ জড়ো হলেন সেখানে। দেশের ওই সঙ্কটময় মুহূর্তে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে কোচবিহারের মানুষজন নিজেদের সঞ্চিত টাকা পয়সা সোনা গয়না, এমনকি লাইসেন্স করা বন্দুক পর্যন্ত তুলে দিলেন মোরারজি ভাই এর হাতে।

মোরারজি রণছোদি ভাই দেশাই অভিভূত হয়ে বললেন, দেশ কোচবিহারবাসীর এই মহানুভবতার কথা চিরদিন মনে রাখবে।

আমাদের ভাড়া বাড়িতে তখন ফিলিপসের তিন ব্যান্ডের একটা রেডিয়ো ছিল। হরিশ পালের দোকান থেকে কিস্তিতে কিনে নিয়ে এসেছিলেন বাবা। সকাল সন্ধ্যা আকাশবাণীর খবরে মুখর হয়ে উঠত আমাদের বাড়ি ও আশপাশের এলাকা। বাবার খবরের নিত্য সঙ্গী ছিলেন প্রচণ্ড রাজনীতি সচেতন আনপড় এক বিহারী পান বিক্রেতা। নাম ছিল তাঁর চরণ ঠাকুর। আমাদের বাড়ির পাশেই থাকতেন। শুনেছি বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কর্পুরী ঠাকুর নাকি ছিলেন তাঁর নিকট আত্মীয়। দেশ বিদেশের সমসাময়িক ঘটনা সম্পর্কে তিনি ছিলেন সম্যক ভাবে ওয়াকিবহাল। কেন্দ্র ও রাজ্যের সমস্ত মন্ত্রীদের নাম ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ। শুধু দেশ নয় আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি সম্পর্কেও তাঁর চুলচেরা বিশ্লেষণ সবাইকে অবাক করে দিত। অথচ মানুষটির কেতাবি বিদ্যা ছিল খুবই সীমিত। সকাল সাড়ে সাতটায় দিল্লি থেকে খবর পড়তেন বিজন বোস, নীলিমা সান্যাল, ইভা নাগ, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়রা। তাঁদের মুখে যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর বীরত্বের বিবরণ শুনে অবুঝ মনেও রোমাঞ্চিত হতাম। প্রায় প্রতিদিনই বাড়ির সামনে দিয়ে চলাচল করা সামরিক বাহিনীর কনভয় দেখলেই যুদ্ধ করতে যাওয়া জওয়ানদের সবাই মিলে দৌড়ে গিয়ে স্যালুট করাটা আমাদের পবিত্র কর্তব্যের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। এরই মধ্যে একদিন ভোরবেলা দুটো চীনা যুদ্ধ বিমান উড়ে গেল কোচবিহারের আকাশ দিয়ে। সেদিন দেখেছি চরণ ঠাকুরের ভয়ার্ত গম্ভীর মুখ। অনেক পরে বুঝেছি, আমাদের জানা সত্যিটা একেবারেই সত্যি ছিল না। ভারত পরাজয় বরণ করেছে সেই যুদ্ধে। কাচারির দেওয়ালে কাগজে লাল কালী দিয়ে লিখে কমিউনিষ্টরা পোস্টার সেটে দিল— 'চীন নয় ভারতই আক্রমণকারী'!

সে সময়কার একটা স্মরণীয় ঘটনার কথা উল্লেখ না করলেই নয়। ফালাকাটার কাছে শৌলমারিতে হঠাৎ করে আবির্ভূত হলেন রহস্যময় এক সাধু। সাধু বাবার নাম সারদানন্দজি মহারাজ। শৌলমারীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হল। তিনি ছিলেন মৌনী বাবা। কারো সাথে কথা বলতেন না। তাঁর সাথে নেতাজীর চেহারার প্রচণ্ড মিল ছিল। হাজার হাজার মানুষ ছুটতে লাগলেন শৌলমারীতে। প্রতিদিন নেতাজি ভক্ত অগণিত মানুষের ভিড়ে শৌলমারী তখন এক তীর্থ ক্ষেত্র। গোয়েন্দা আর সাংবাদিকদের সৌজন্যে গোটা দেশের সংবাদ শিরোনামে তখন শৌলমারী। আমরা তখন ক্লাস সিক্স-এ পড়ি। একদিন আমাদের মাষ্টার মশাই বারীনবাবু এসে বললেন, সারদানন্দজিকে তিনি আমাদের স্কুলে নিয়ে আসবেন। দিনক্ষণ ঠিক হল। হেড মাষ্টার মশাই কালীপদবাবু বললেন, উনি আসবেন। তবে তোমরা ওনাকে কোনও প্রশ্ন করতে পারবে না। ওনাকে স্পর্শ করাও যাবে না। ওনার যা কিছু বলার উনি লিখে দেবেন কাগজে। ওনার এক সহকারী সেটা পাঠ করে শোনাবেন। সত্যি সত্যিই বাবা এলেন। লুঙ্গির মত করে একটা সাদা ধুতি আর সাদা একটা ফতুয়া পরিহিত। মুখে সাদা লম্বা দাড়ি আর চোখে কুচকুচে কালো একটা রোদ চশমা। দেশ আর সমাজের জন্য ছাত্রদের কী কী কর্তব্য ও করনীয় তা তিনি সুন্দর

কোচবিহার রাজবাড়ির হাতির সজ্জা। সৌজন্যে: গেটি ইমেজেস

সকাল সাড়ে সাতটায় দিল্লি থেকে খবর পড়তেন বিজন বোস, নীলিমা সান্যাল, ইভা নাগ, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়রা। তাঁদের মুখে যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর বীরত্বের বিবরণ শুনে অবুঝ মনেও রোমাঞ্চিত হতাম। প্রায় প্রতিদিনই বাড়ির সামনে দিয়ে চলাচল করা সামরিক বাহিনীর কনভয় দেখলেই যুদ্ধ করতে যাওয়া জওয়ানদের সবাই মিলে দৌড়ে গিয়ে স্যালুট করাটা আমাদের পবিত্র কর্তব্যের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। এরই মধ্যে একদিন ভোরবেলা দুটো চীনা যুদ্ধ বিমান উড়ে গেল কোচবিহারের আকাশ দিয়ে।

ভাবে লিখে দিলেন। যা আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই পড়ে শোনানো হলো। তিনি হাত নেড়ে সবাইকে অভিবাদন জানালেন। আমরা সবাই মিলে বললাম, 'জয় বাবা সারদানন্দের জয়'। নেতাজি ভক্তদের আটকে রাখা গেল না। তাঁদের মধ্যে থেকে আওয়াজ উঠল, 'জয়তু নেতাজী' 'নেতাজী জিন্দাবাদ'। চলে যাবার সময় ফটোগ্রাফিক এম্পরিয়ামের ধীরুদা লুকিয়ে চুরিয়ে বাবার কয়েকটা ছবি তুলেছিলেন। সেই ছবির জন্য হন্যে হয়ে মানুষজন তাঁর স্টুডিওতে ভিড় জমালেন। শৌলমারীর সাধু সত্যিই নেতাজি ছিলেন কি না, সে প্রশ্নের উত্তর আজও রহস্যাবৃত হয়ে আছে।

১৯৬২ সালের ১ জুলাই পশিচমবঙ্গের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধান চন্দ্র রায়ের মৃত্যু হল। মুখ্যমন্ত্রী হলেন প্রফুল্লচন্দ্র সেন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তখন অতুল্য ঘোষ। সেবারকার নির্বাচনে কোচবিহারে কংগ্রেসের ভরাডুবির পর দলকে নতুন ভাবে সাজাতে তরুণ নেতা সন্তোষ কুমার রায়কে বেছে নিলেন অতুল্য-প্রফুল্ল জুটি। বর্ষীয়ান নেতা সুধীর (বিশু) নিয়োগী, যুব নেতা প্রসেনজিৎ বর্মন আর তরুণ চিকিৎক মহ. ফজলে হককে নিয়ে গোটা জেলা চষে বেড়াতে লাগলেন বিচক্ষণ কংগ্রেস নেতা সন্তোষ কুমার রায়। রাজবংশীদের পাশাপাশি উদ্বাস্তুদের মধ্যেও সংগঠন গড়ে তোলার উপর জোর দিল কংগ্রেস। উদ্বাস্তুদের মধ্যে দলের প্রভাব বাড়াতে সন্তোষ রায়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস নেতারা পাতলাখাওয়া থেকে জোড়াই-রামপুর পর্যন্ত সর্বত্র ছুটে বেড়াতে লাগলেন। তখনও কোচবিহারে ছাত্র পরিষদের সংগঠন গড়ে ওঠে নি। যুব সংগঠন বাড়াতে কংগ্রেস সেবাদলকে চাঙ্গা করে তুলতে প্রচেষ্টা শুরু হল। শহরের ব্রাহ্মমন্দিরের মাঠে নিয়ম করে প্যারেড হত কংগ্রেস সেবাদলের। সুধীর পাল, প্রদীপ দাশ আর গুপীনাথ চক্রবর্তীরা সাদা শার্ট-প্যান্ট আর গান্ধী টুপি পড়ে প্যারেড শেখাতেন সেবাদলের সেচ্ছাসেবকদের।

এদিকে বিধায়ক নির্বাচিত হয়ে ফরওয়ার্ডব্লক নেতা কমল গুহ আর অমর রায় প্রধানরা পাকিস্তানকে বেরুবাড়ি হস্তান্তরের কেন্দ্রীয় প্রস্তাবের বিপক্ষে আর অসম থেকে বাঙালি বিতারণের বিরুদ্ধে বিধানসভায় তুমুল ঝড় তুললেন। স্পিকারের হাতুড়ি আর মার্শালের গদা কেড়ে নিয়ে মাঝে মধ্যেই বিধানসভায় হৈচৈ জুড়ে দিতেন কমল গুহ। জঙ্গি নেতা হিসেবে গোটা রাজ্যে খ্যাত হয়ে উঠলেন কমল গুহ। গোটা জেলায় তখন ফরওয়ার্ডব্লকের জয়জয়কার, বিশেষ করে কমল গুহর সুবাদে দিনহাটায়। লোকে সে সময় বলতে শুরু করল, 'সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক, হেড অফিস দিনহাটা'।

(ক্রমশ)

এ নদী কেমন নদী

মালদা জেলায় নদীগুলি নিয়ে চেতনা আসবে কবে?

তুহিন শুভ্র মন্ডল

মালদা— নামটি বলতেই ইতিহাস, ঐতিহ্যের কথা যেমন মনে আসে। তেমনই মালদা মানেই আম। কিন্তু সম্প্রতি আরো একটি বিষয় মালদার ক্ষেত্রে বারবার সামনে আসছে তা হল— মালদা জেলার নদী। আর মালদা জেলার নদীর কথা বলতেই উঠে আসে গঙ্গা, মহানন্দা, ফুলহার, বেহুলা, পাগলা, কালিন্দী, টাঙ্গন, পুনর্ভবা, তিলজলা, চিন্তামনি, বড়মসিয়া, ভাগীরথীর অংশ ইত্যাদি। কেমন আছে সেইসব নদী? জনগণ কি সচেতন নদীগুলি নিয়ে? প্রশাসন কি জেগে আছে? এই প্রতিবেদনে সেসব আলোচনা করা যাক।

মালদার নদীগুলি নিয়ে যদি এককথায় লিখতে হয় তাহলে বলতে হয়— দখলে, দূষণে, ভাঙ্গনে, জলহীনতায় ভয়ংকর অবস্থা মালদা জেলার নদীগুলির। একটু বিশদে দেখি এবার...

হায়রে মহানন্দা!

একথা বলার কারণ আছে। কেননা মহানন্দা নদীকে দেখলে আপন মনেই এই তোমার কথা বেরিয়ে আসে। আর হবে নাই বা কেন? একি অবস্থা মহানন্দার? একে কি নদী বলে? ক'দিন আগের কথাই ধরা যাক। দুর্গা পুজোর সময়। দশমী পেরিয়ে যাওয়ার পাঁচদিন পরেও কোনও হেলদোল নেই। তাও বা দুর্গা পুজোর সময় যতটা থাকে, অন্য পুজোর সময় বা অন্য সময় তাও থাকে না। মহানন্দা নদীর বালুচর, মিশন ঘাট এলাকায় গেলেই দেখা যায় যে শহরের আবর্জনা নদীর জলের পাশেই জমা করা হয়েছে। জলের রং বর্ষার সময় ছাড়া গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। মিশন ঘাট থেকে একটু এগোলে দেখা যায় নদীর উপর দিয়ে এপার-ওপার রাস্তা এবং বোঝাই যায় পুরোদস্তুর মাটি ফেলে নদীর মাঝখান দিয়েএই রাস্তা ব্যবহার হয় নিয়মিত। যে কয়েকবার মহানন্দার কাছে গিয়েছি তার মধ্যে বেশ কয়েকবার ব্রিজ থেকে নদীর জলে নোংরা-আবর্জনা ফেলতে দেখেছি। মহানন্দাকে কি তাহলে মানুষ ভালবাসে না?

নদী কি তাহলে ডাস্টবিন?

আপনি যদি বেহুলা নদীকে দেখেন মনে হবে ডাস্টবিন। আপনি যদি মহানন্দা নদীও দেখেন, মনে হবে একই কথা। একই অবস্থা অন্য নদীরও। প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ, বাচ্চাদের ডায়াপার, প্রতিমার কাপড়, চুল, ডাবের খোল, ময়লার ঢিবি কী নেই? ফলে দূষণ অন্য জেলার মত মালদা জেলার নদীগুলিতে একটি সাধারণ বিষয়। এখানেই একটা প্রশ্ন উঠে আসে সভ্যদেশে এটা সম্ভব? নদী কি তাহলে ডাস্টবিন? কেন নেই সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা? বিভিন্নভাবেই পৌরসভার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে বারবার জানানো হয় যে তারা ভাবছেন। এই ভাবা শেষ হবে কবে?

হারিয়ে যাওয়া নদীর নাম বেহুলা

দক্ষিণ দিনাজপুরের যেমন হারিয়ে যেতে বাস নদীর নাম ব্রাহ্মণী, তেমনই মালদার বেহুলা। একটি হারিয়ে যাওয়া নদীর নাম বেহুলা। বিষাক্ত কারখানার জল এসে বেহুলা নদীকে বিষাক্ত করছে। পুরাতন মালদা ব্লকের নারায়ণপুর এলাকায় রয়েছে একাধিক নামী কারখানা। হরলিক্সের স্টার্চ, সিল্ক, অ্যালুমিনিয়ামসহ বিভিন্ন কারখানার বিষাক্ত জল, বেরিয়ে মিশছে এই নদীতে। এই বেহুলা নদীর জলে স্নান করেই এলাকাবাসীদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে ঘা চুলকানি ও অন্যান্য চর্মরোগ। বিষাক্ত জলে মারা যাচ্ছে নদী ও সংলগ্ন বিভিন্ন পুকুরের মাছ, জল হচ্ছে দূষিত। চাষবাসও ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। পুরাতন মালদার ব্লকের প্রায় দশ হাজার মানুষ বেহুলা নদী ভাল না থাকার জন্য আক্রান্ত। বেহুলা নদীর কাছে গেলেই দেখা যাবে নদীতে এখন জল নেই। কচুরীপানায় ভর্তি।

মালদায় নদীর দূষণ

দক্ষিণ দিনাজপুরের বিপন্ন নদী যেমন ব্রাহ্মণী, তেমনই মালদার হারিয়ে যাওয়া নদীর নাম বেহুলা।

গঙ্গা, ফুলহারের ভাঙন

মালদহে গঙ্গা ও ফুলহার নদীর ভাঙন একটা অন্যতম পরিবেশ সঙ্কট। মানিকচকের নদী বাঁধ সংলগ্ন গ্রামের বাসিন্দারা, মথুরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শঙ্করটোলা ঘাট, কালিয়াচক-৩ ইত্যাদি এলাকায় ভাঙনে মন্দির, মানুষের ভিটেমাটি, বাড়ি সব জলের তলায়। নদীগুলির ভাঙন প্রবণতার জন্য মানুষ বড় বিপদে। রতুয়ার মহানন্দটোলা, বিলাইমারি পঞ্চায়েতের গঙ্গা-ফুলহারের ভাঙনও চিন্তায় ফেলেছে মানুষ-প্রশাসনকে। এর থেকে মুক্তির পথ কী? আর কত ক্ষতি করবে নদী— উঠতে শুরু করেছে প্রশ্ন। মালদার ক্ষেত্রে নদী ভাঙন শুধুমাত্র বিপদ নয়, বিপর্যয়ে পরিণত হয়েছে। ধরা যাক, পঞ্চানন্দপুরের এলাকা। ১৯৮৩ সালের আগে এই এলাকা ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার অধীন। ভাঙনের ফলে এই এলাকা মালদা জেলায় চলে আসে। বর্তমানে ভাঙনের যা অবস্থা, তাতে আবার মানচিত্র বদলে যেতে পারে।

বন্যা- আরেকটি প্রধান বিপর্যয়

মালদা জেলার নদী ব্যবস্থাপনায় আরেকটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা বন্যা। গঙ্গা, মহানন্দা, ফুলহার, কালিন্দী নদীতে বন্যার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ, বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। অন্য জেলার বন্যা পরিস্থিতিও মাঝে মাঝে ভয়ংকর হয়, কিন্তু মালদাতে তা আরও বেশি। নদীর তলদেশে পলি নদীর নাব্যতা প্রবলভাবে কমিয়ে দিয়েছে। ফলে মালদা জেলায় মুর্হুমুহু তৈরি হচ্ছে বন্যা পরিস্থিতি। রতুয়া-২ নং ব্লকের, মাদিয়াঘাট, কালিয়াচক-২ ব্লকের হামিদপুর চর, সাকুল্লাপুর গ্রাম, মহানন্দার জলে ইংরেজবাজারের বালুচর এলাকায় জলমগ্নতার বীভৎস চিত্র কারও অজানা নয়। বন্যা ব্যবস্থাপনার জন্য নদীগুলোর দিকে নজর দেওয়া দরকার। সেটা কি হচ্ছে? এই প্রশ্ন এখন জোরালোভাবে করা দরকার।

নদী নিয়ে সাম্প্রতিক ঘটনাবলী

সাম্প্রতিক কালে মালদার যে নদী বারবার সামনে এসেছে দখল, দূষণ, উদাসীনতা ইত্যাদি নিয়ে তা হল মহানন্দা। মালদা ও পুরাতন মালদার জীবনরেখা। কিন্তু বর্তমানে মহানন্দার হাল বেহাল। শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত মালদার মহানন্দার দূষণের মাত্রা সর্বাধিক। বালুচর, মিশনঘাট ইত্যাদি এলাকায় গেলে বোঝা যায় নদীর অবস্থা কী! নরক বললেও কম বলা হয়। মহানন্দা নদীর হাল ফেরাতে একসময় মালদা বিজ্ঞান মঞ্চ নিরলস চেষ্টা করেছে। মালদার নাগরিকগণ নদীটির সাম্প্রতিক অবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন। কিছুদিন আগে মালদা জেলার নদী, পরিবেশ ও বিজ্ঞান কর্মীদের নিয়ে গঠিত হয়েছে মালদা নদী ও জলাভূমি বাঁচাও মঞ্চ। মালদা কলেজে তারা একটি আলোচনাসভারও আয়োজন করেছিল। প্রস্তুতি চলছে মালদার জীবনরেখা মহানন্দা নদীকে বাঁচাতে গণ কনভেনশনের।

নদী বাঁচাতে জেলাশাসককে চিঠি

ওয়ার্ল্ড এডুকেশন সামিটে যোগদান করে ফিরছি বালুরঘাটে। মালদায় নেমেছিলাম তার আগে। অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল নদী দর্শন। মহানন্দার সেই ভয়ংকর অবস্থা দেখে জেলা শাসককে চিঠি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। শুধু জেলাশাসক নয়, ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যানকে মহানন্দার দুরবস্থার কথা জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়। তারপর আবার মহানন্দা নদীর পাড় জবরদখল করা নিয়েও জেলাশাসককে চিঠি দেওয়া হয়। বিষয়বস্তু ছিল অবিলম্বে জেলাশাসকের হস্তক্ষেপ। কিন্তু দুর্ভাগ্যের যে, জেলাশাসক মহানন্দাকে ভাল রাখতে এখনও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি।

মালদার নদীর জন্য রাজ নদী বাঁচাও কমিটির ভাবনা

সবুজ মঞ্চের উদ্যোগে গঠিত হয়েছে রাজ্য নদী বাঁচাও কমিটি। প্রতি জেলায় জেলায় নদী বাঁচাও কমিটি গঠনের পর নদী সংক্রান্ত পরিকল্পনার বাস্তবায়নে জোর দেওয়া হয়। তাতে স্থান পায় মালদার বিভিন্ন নদীও। উত্তরবঙ্গের প্রথম নদী ও জলাভূমি বাঁচাও কনভেনশন হয়েছিল শিলিগুড়িতে। আয়োজক ছিল রাজ্য নদী বাঁচাও কমিটি (সবুজ মঞ্চ) এবং শিলিগুড়ি পরিবেশ বাঁচাও মঞ্চ। সেখানে মালদার নদীগুলির ভয়াবহ অবস্থার কথা তুলে ধরা হয় মালদা নদী ও জলাভূমি বাঁচাও মঞ্চের পক্ষ থেকে। এছাড়াও রাজ্য নদী বাঁচাও কমিটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের আঞ্চলিক শাখায় (শিলিগুড়ি সংলগগ্ন মাটিগাড়া) ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনালের দেওয়া পশ্চিমবঙ্গের সতেরটি বিপন্ন নদীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এই মর্মে স্মারকলিপি প্রদান করে।

নদী তুমি কার?

কী আশ্চর্য, প্রশাসনের এক দপ্তর আরেক দপ্তরের কাছে দরবার করছে নদী দখল মুক্ত করার জন্য। তার মানে নদী দখল হচ্ছে। আর নদী যে দখল হচ্ছে সেকথা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। কখনও বিয়েবাড়ির প্যান্ডেল হচ্ছে নদীর বুকে, কখনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন, খাটাল, ঘরবাড়ি, কারখানা স্থাপন- কী নেই? ইংরেজবাজার ও পুরাতন মালদায় মহানন্দা নদীর পাড়ে অবৈধভাবে গজিয়ে ওঠা বাড়িঘর উচ্ছেদের জন্য সেচদপ্তর জেলাশাসক এবং ইংরেজবাজার ও পুরাতন মালদার পৌরধ্যক্ষদের দ্বারস্থ হয়েছে। এখানে বলা দরকার ইংরেজবাজার ও পুরাতন মালদা, মহানন্দার দুই ধারে পাশাপাশি গড়ে ওঠা দুই শহর। দুই শহরেই মহানন্দার পাড়ে অবৈধভাবে গজিয়ে উঠেছে প্রচুর বাড়িঘর। কিন্তু ভূমি ও ভূমিরাজস্ব দপ্তরের ১৯৯১ সালের আইন বলছে, নদীর তীরে কোনও স্থায়ী নির্মাণ স্থাপন করা সম্পূর্ণ বেআইনি। অথচ এটা হয়েছে এবং হচ্ছে। এবং তার এখনও সুরাহা হয়নি। বিষয়টি নিয়ে দরবার করছে রাজ্য নদী বাঁচাও কমিটিও।

নদী নেই জীবন-জীবিকাও নেই

মহানন্দা, গঙ্গা, ফুলহার, বেহুলা, কালিন্দী ইত্যাদি নদীর অবস্থা যে তথৈবচ তা ইতিমধ্যেই বোঝা গিয়েছে। এইসব নদীকে ঘিরে যারা জীবন-জীবিকা নির্বাহ করতো তাদের গলায় হতাশার সুর। যে দেশিয় প্রজাতির মাছগুলো পাওয়া যেত, সেগুলি এখন নেই। ফলে যারা একে কেন্দ্র করে জীবন অতিবাহিত করতো তারাও প্রবল সঙ্কটে। তারা অন্য পেশায় ভিড় করছে। তৈরি হচ্ছে এক প্রবল অর্থনৈতিক ও সামাজিক সঙ্কট।

নদীর হাল ফেরাতে মানুষ কি জোট বাঁধছে

এক কথায় উত্তর, বাঁধছে। সচেতন নাগরিকরা একসাথে ভাবছে। কী করা যায় তার পরিকল্পনা করছে। মালদা নদী ও জলাভূমি বাঁচাও মঞ্চের পক্ষ থেকে পৌরসভা ও জেলাপ্রশাসনের কাছে দরবারের প্রস্তুতি চলছে। এখানে প্রয়োজন প্রতিনিয়ত কর্মসূচী গ্রহণ। আর একটি বিষয় জরুরি। তা হল— স্কুল কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়াদের এই কাজে যুক্ত করার। একটা ব্যাপক গণজাগরণ তৈরি না করতে পারলে নদী-সভ্যতা বাঁচবে না। কিছুদিন আগে মালদা বিজ্ঞান মঞ্চের সভাকক্ষে রাজ্য নদী বাঁচাও কমিটির আহ্বানে একটি সম্মিলিত সভায় পরিবেশ কর্মী, বিজ্ঞান আন্দোলন সংগঠক, কবি, চিকিৎসক, বুদ্ধিজীবী, পড়ুয়ারা একজোট হয়ে মালদার নদী ও পরিবেশ বাঁচানোর কর্মসূচী নিয়েছে। সময়ের সাথে সাথে তাকে বাস্তবায়িত করতে হবে। তাহলে নদী বাঁচবে, নচেৎ নয়।

কী আশ্চর্য, প্রশাসনের এক দপ্তর আরেক দপ্তরের কাছে দরবার করছে নদী দখল মুক্ত করার জন্য। তার মানে নদী দখল হচ্ছে। আর নদী যে দখল হচ্ছে সেকথা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। কখনও বিয়েবাড়ির প্যান্ডেল হচ্ছে নদীর বুকে, কখনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন, খাটাল, ঘরবাড়ি, কারখানা স্থাপন- কী নেই? ইংরেজবাজার ও পুরাতন মালদায় মহানন্দা নদীর পাড়ে অবৈধভাবে গজিয়ে ওঠা বাড়িঘর উচ্ছেদের জন্য সেচদপ্তর জেলাশাসক এবং ইংরেজবাজার ও পুরাতন মালদার পৌরধ্যক্ষদের দ্বারস্থ হয়েছে। এখানে বলা দরকার ইংরেজবাজার ও পুরাতন মালদা, মহানন্দার দুই ধারে পাশাপাশি গড়ে ওঠা দুই শহর। দুই শহরেই মহানন্দার পাড়ে অবৈধভাবে গজিয়ে উঠেছে প্রচুর বাড়িঘর। কিন্তু ভূমি ও ভূমিরাজস্ব দপ্তরের ১৯৯১ সালের আইন বলছে, নদীর তীরে কোনও স্থায়ী নির্মাণ স্থাপন করা সম্পূর্ণ বেআইনি। অথচ এটা হয়েছে এবং হচ্ছে। এবং তার এখনও সুরাহা হয়নি।

বউ সাথে পথে পথে। পর্ব-১০

বাংলার হিমালয় পরিক্রমা

গৌরীশংকর ভট্টাচার্য

তরাই, ডুয়ার্স সমতলের সাতকাহন, স্মৃতির উজান ভাঁটায় সন্তরণ থেকে একটু চড়াই উৎরাই পথে বিচরণ করি। গালগপ্পো শোনাই। একেবারে সইত্য কথা। শৈশব, কৈশোরে আমাদের বাড়ির উঠোন থেকে নীল পাহাড়টা স্পষ্ট দেখা যেত। মেঘমুক্ত শরতে ঝলমলে কাঞ্চনজঙ্ঘা, সবুজ বনরেখা, সন্ধ্যায় তিনধারিয়ার আলোর ফুলকি যেন মিটিমিটি জ্বলছে, মালার মতো দুলছে। শীতে হাঁড় পাঁজর কাঁপানো ঠান্ডা। ঘরে কাঠকয়লা জ্বেলে মা-কাকীমা-জেঠিমারা আগুন তাপাতো। রান্নাঘরে লকরির উনোন ঘিরে ভ্যাদরাপাঁচালি। বিছানায় যেন বরফ ঢালা। লেপের নিচে কম্বল দিয়ে এ-পাশ ও-পাশ করে ঘুমানো। শেষ রাতে শুনতাম এই বৈরাগীর গান 'রাই জাগো, রাই জাগো, ঘুমায়ো না আর'। সকালে রোদ পোহানো। শতে ভোটেরা আসত হুম হুম শব্দ করতে করতে। ভয়ে দে দৌড়। সাপুড়ে আসত পেট মোটা বাঁশি বাজাতে বাজাতে। শীত মানে পিঠে পায়েস পুলি মালপোয়া। কত কী! পরিশ্রমও করতে পারত মায়েরা। বাসী হলে পিঠে খেয়ে মজা। রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে বসা। এখন ঘরে রোদ ঢোকে না। অনেকে রুমহিটার, ব্লোয়ার ব্যবহার করে। আবার সেই খাওয়ার গপ্পো।

ক্লাস নাইনে যখন পড়ি পিতামাতার অনুমতি নিয়ে দার্জিলিং বেড়াতে যাই। বলাবাহুল্য খেলনা ট্রেনে। আমরা চার বন্ধু। ভারি মজার ট্রেন। হিলকার্ট রোড দিয়ে পঞ্চনই জংশন, শুকনা, রংটং, মহানদী, তিনধরিয়া, কার্শিয়াং, সোনাদা, ঘুম হয়ে দার্জিলিং। পৌঁছাতে পৌঁছাতে অন্ধকার। তাতে কী। স্টেশনে নেমে দে দৌড়। সটান কালীবাবুর হোটেল। সেন্ট্রাল বোর্ডিং। দারুণ মজাদার মানুষ ছিলেন। বললেন, 'দ্যাখো বাপু সারাদিন ঘুরে বেড়াবে। রাতে শোবে খাওয়াদাওয়া করবে। তাই তো?' তক্তোপোষের নিচেও শোবার ব্যবস্থা। অঢেল লেপ কম্বল। মুস্তাফিদের হিন্দু বোর্ডিং ছিল মনে পড়ে। শেষ রাতে হৈ হৈ করে টাইগার হিল। তারপর অসংখ্যবার দার্জিলিং যাওয়া। জলাপাহাড় ক্যান্টনমেন্ট বড়দার কোয়ার্টার, গুড্ডিরোডে দিদির ভাড়াবাড়িতে। কখনও বা লুইস জুবলি স্যানিটোরিয়াম। ম্যালে কাছে একবারই ছিলাম অজিত ম্যানশনে, বাবার সঙ্গে।

আরেকটি শতবর্ষ প্রাচীন সাংসের সিনকোনা বাংলো। কদাচিৎ কোনও পথ ভোলা পথিক এখানে আসেন। অনেকে খোঁজই রাখেন না। পাশেই সুসজ্জিত সাংসের হোমস্টে। কালিম্পং থেকে ডেলো দর্শন কিংবা একদিন কাটিয়ে অনায়াসে চলে আসুন সাংসের। তারপর ইচ্ছেগাঁও। তারপর যেখানে ইচ্ছে যান। তারপর আলগাড়া, লাভা। রাস্তা খুবই খারাপ। লাভা যাবার পথ খুবই ঘিঞ্জি। লাভা থেকে এবরো খেবরো পথে সোমাবিয়াং চা-বাগান হয়ে ঝাণ্ডি।

বিয়ের পর দুজনে বেরিয়ে পড়ি শৈলশহরের টানে। সস্তার হোটেলে হৈ হৈ— বোটানিক্যাল গার্ডেন, চিড়িয়াখানা। অবশ্যই ম্যাল চত্বর। তবে দার্জিলিঙে আমার সবথেকে বড় আকর্ষণ এই বয়সেও ল্যাডেনলা রোডে ক্যাভেন্টার্সের রোদালো ছাদে বসে তারিয়ে তারিয়ে সুগন্ধি চা পান। সঙ্গে তুলতুলে পেসট্রি, কেক না হলে হটডগ, বার্গার। পাশেই বিখ্যাত প্ল্যান্টার্স ক্লাব। একটা সময়

সাংসের বনবাংলো

দার্জিলিঙের গলিঘুজি চুঁড়ে বেড়াতাম। কুয়াশায় লুকোচুরি খেলা। বলতে দ্বিধা নেই শৈলশহর এখন বড্ড ঘিঞ্জি, কদর্য, নোংরা, যানজটে লেজেগোবরে। হাঁটাচলা করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। যেতেই ইচ্ছে করে না। কয়েক বছর আগে গান্ধি রোডে হেরিটেজ সুইস হোটেল সস্ত্রীক আয়েস করে কাটাই পাশে একদিন ভাইসরয় আমার ছাত্রের কল্যাণে। তবু বলি, যত বিরূপ মন্তব্য করি না কেন, রাগ অভিমান করি— মন বলে চলো যাই দার্জিলিং। অকারণ ঘুরে বেড়াই চকবাজার, কেকের গন্ধ, রাই শাক, ঢোলে খরসানি, গুনরুক কা ঝোল, শেলরুটি, একটু একটু রকসি আড়ালে আবডালে কেউ খায়। আজকের দার্জিলিঙের পথে যখন হেঁটে বেড়াই তখন মনে হয় এই পথে এসেছিলেন ক্যাম্বেল, লয়েড, গ্রান্ট, হুকার কত সাহেব মেম। উইন্ডামিয়ার হোটেল। কাঞ্চনজঙ্ঘার দুর্নিবার আকর্ষণ। এখন সেখানে বারো ভূতের আড্ডা। দার্জিলিঙের যেন ছালবাকল উঠে গেছে। মনে পড়ে ধোবিতলার স্যাঁতস্যাতে সিঁড়ি, কনকনে ঠান্ডা। লেবঙের পথে হ্যাপি ভ্যালি, রাংলিওট চা-বাগানে থাকার স্মৃতি।

মনে পড়ছে দত্ত সাহেবের অনুরোধে হপ্তাখানেকের জন্য সস্ত্রীক থিতু হয়েছিলাম রংমুখ অ্যান্ড সিডার চা-বাগানে। সোনাদা থেকে লাট্টুর মত গড়াতে গড়াতে নামা বোল্ডার বিছানো পথে। একদা এখানে ব্রিটিশদের প্রবল ইচ্ছা ছিল ম্যাকলাসকিগঞ্জের মতন গড়ে তোলা এক্সক্লুসিভ মিনি ইংল্যান্ড। নাম হবে হোপটাউন। সেটা শেষ পর্যন্ত হোপলেস হয়। তবে হেরিটেজ বাংলো অনবদ্য কারুকার্য, ডাইনিং রুম, লাউঞ্জ এমনকী ক্রকারিজ রুম। সব কিছু দেখার মত। প্রশস্ত বারান্দা, সবুজ লন, ফুলে ফুলে ছয়লাপ। তেমনই খানাপিনা। গিন্নির একটা কথা সত্যিই সুন্দর! সিডার থেকে মুন্ডাকোঠী পাতালে প্রবেশ। বালাসন নদীর কোলে। কমলা লেবুর বাগান, চা-বাগান তো আছেই। যতখুশি কমলা খাও। আমি ঝোলার মধ্যে ঢোকাই এবং চা, কেক, ভাজাভুজি খেয়ে মুন্ডাকোঠীর সৌন্দর্য দর্শন। মুন্ডাকোঠী থেকে আবার ফিরে আসি রংমুখ সিডারে। বছরখানেক বাদে আবার রংমুখে বেড়ানো। বহুকাল যাওয়া হয় না। মেমসাহেব, সাহেবরা কে কোথায় জানি না কয়েক বছর আগে বানারহাট রেলওয়ে লেবেলক্রসিঙে হঠাৎ দেখা দত্ত সাহেবের সঙ্গে। 'হ্যালো ভট্টাচার্জি। এখানে কোথায়? আছেন কেমন? মনে পড়ে আমাকে? রংমুখ অ্যান্ড সিডার? এখনও কি ঘুরে বেড়ান?'

ঘুম শব্দটি বাংলা, কিন্তু কে নামকরণ করেছিল জানা নেই। অনেকে বলেন রবিঠাকুর। 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে'। চারিদিকে ঘন কুয়াশা। তারই মাঝে ঘুম যেন ঘুমিয়ে আছে। ঠাণ্ডার দাপটটা যেন একটু বেশি। ঘুম থেকে দুজনে হি-হি, হু-হু করতে করতে চলে আসি লেপচা জগতের বন উন্নয়ন নিগমের বাংলোতে। রডোডেনড্রন, পাইন, ফার, ওকস কত শত গাছে সমাচ্ছন্ন। নিচ তলায় আমাদের জন্য ঘর বরাদ্দ। সমস্যা হল বিরূপ বিদঘুটে আবহাওয়া। কনকনে ঠান্ডা। জাম্বুমানের পোশাক পরেও ঠক ঠক করে কাঁপছি। বাইরে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। ড্রাইভার কিশোর এসে বলে— কাকিমা চলেন ঘুরে আসি। বৃষ্টি কমে যাবে। প্রস্তাব মন্দ নয়। কুক-কাম চৌকিদারকে বললাম 'রাতে খিচুরি, আলু ভাজা, পাঁপড় ভাজা আর ডিমের ওমলেট বানাও। এখন

কোলাখাম-এ জঙ্গলের পথে

কুয়াশা ভরা দার্জিলিঙের রাস্তায় নাচ

সবুজে ভরা ফাগু

একটু চা দাও।' সে সময় লেপচাজগত সত্যি নিরিবিলি ছিল। চা খেতে খেতে দেখি মেঘ উধাও। আধখানা নীল আকাশ। জোড়পোখরিতে অনেকে বেড়াতে আসে রাতে থাকেও। চমৎকার পুকুর, হাঁস, সালামান্ডার, সিমেন্টের তৈরি সাপের ফণা। ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে আমরা মিম চা-বাগানে দু'চক্কর দিয়ে সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে ফিরে আসি লেপচাজগতে।

পাহাড় আমাদের দুজনকেই ভীষণভাবে টানে, তবে যৌবনের উন্মাদনা, তারুণ্যের টগবগে জোয়ার এখন ক্রমশ ভাঁটার দিকে 'তবু মন চলো দূরে কোথাও। দূরে বহু দূরে।' হঠাৎ একদিন মংপুর কেমিস্ট রেনুপদ নন্দীর সঙ্গে শিলিগুড়িতে দেখা হতেই অনুরোধ, 'গৌরীবাবু মংপু তো অনেকবার আসা যাওয়া, থাকা, ঘোরাঘুরি করেছেন। একবার অবশ্যই বৌদিকে নিয়ে ক'দিন নিরিবিলি নির্জন আনন্দে জলসা বাংলোতে কাটিয়ে আসুন। সিনকোনা প্ল্যানটেশন চমৎকার হেরিটেজ বাংলো যদিও সেভাবে রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে না। আপনার ভীষণ ভাল লাগবে। গিন্নি সঙ্গে সঙ্গে নেচে ওঠে। জলসার সঙ্গে যুক্ত করে নিলাম রংপোর বনবাংলো। সঙ্গে গাড়ি তো আছেই। ক'দিনের জন্য রসদ সংগ্রহ করে নিই, প্রয়োজনে দেখা যাবে। সত্যি জলসার তুলনা নেই। লা জবাব। একটা টেবিলল্যান্ড। যেদিকে চোখ যায় মেঘের ভেলা নীল আকাশের কোলে। সবুজ ঘাসের আস্তরণ বিছানো যেন মখমলে ভেলভেট। শান্ত নির্জন। একজন প্রবীণ দাজুভাই আমাদের দেখার জন্য নিযুক্ত। এতটুকু ত্রুটি বিচ্যুতি নেই। আমার স্ত্রী চট করে নেপালি পরিবারে মিশে যায়। ভুলভাল হিন্দি নেপালি বাংলার গুরুচন্ডালী। একেবারে উনুনের ধারে বসে আসর মাতিয়ে তোলে। সত্যি বলছি জলসার তুলনা নেই। দুজনে গেজেবোতে বসে থাকতাম। চা, পকোরা, যা হোক একটা কিছু আসত। ঘন্টিপোকাদের গান, চারিদিকে সবুজের মেলা তারই মাঝে ফুলের জলসায় জলসা বাংলো যেন হাসছে। তুমি আর আমি শুধু জীবনের খেলাঘর/হাসি আর গানে ভরে তুলব। যত ব্যথা দুজনে ভুলব। —শ্যামল মিত্রের হৃদয় নিংড়ানো গান। জলসা থেকে রংপো বাংলো। এখন আধুনিকতার ছোঁয়া। বাংলো থেকে ঘরে ঢোকা মানে বাড়ি ফেরা। অনেক পরে জানতে পারি রেনুপদ চিরকালের মতন চলে গেছে। উত্তরবঙ্গ সংবাদে ভেষজ গাছের গুণাগুণ নিয়ে নিয়মিত কলাম লিখত।

আরেকটি শতবর্ষ প্রাচীন সাংসের সিনকোনা বাংলো। কদাচিৎ কোনও পথ ভোলা পথিক এখানে আসেন। অনেকে খোঁজই রাখেন না। পাশেই সুসজ্জিত সাংসের হোমস্টে। কালিম্পং থেকে ডেলো দর্শন কিংবা একদিন কাটিয়ে অনায়াসে চলে আসুন সাংসের। তারপর ইচ্ছেগাঁও। তারপর যেখানে ইচ্ছে যান। তারপর আলগাড়া, লাভা। রাস্তা খুবই খারাপ। লাভা যাবার পথ খুবই ঘিঞ্জি। হোটেল, লজ, হোমস্টে, রেস্তোরাঁ যেন ঠাসাঠাসি। লাভা থেকে এবরো খেবরো পথে সোমাবিয়াং চা-বাগান হয়ে ঝান্ডি। একদা আমরা দুজনে লাভা থেকে রিকিসুম ভূত বাংলোতে বেড়াতে যাই। এখানে এলে অবশ্যই মনে পড়বে স্টোরি অফ ভুটান ডুয়ার-এর লেখক সার্জেন রেনি। ডামসাং দুর্গের কথা। রিকিসুম-এর অনবদ্য বাংলো যেখানে ছিল যেখানে থাকার অনুমতি দিতেন দার্জিলিঙের ডিএম। ব্রিটিশদের তৈরি বাংলোটি শেষ পর্যন্ত মর্গান হাউস কী সুন্দর টিকে আছে। রিকিসুমে দুজনে ঝোপঝাড় ভেদ করে কঙ্কালসার পোড়ো বাড়িটার চিমনি দেখি। পরবর্তীকালে রোজেন রাই রিকিসুমে গড়ে তোলে 'স্বর্ণ শিখর লজ'। সঙ্গে ভজনবাবাজি। ভজন এখন কোথায় জানি না। ওরই তাগাদা অনুরোধে দুজনে ক'দিন কাটাই পেডং-এর নীলপাহাড়ি। উল্টো দিকে ডামসাং গোরি দুর্গ, প্রশস্ত মাঠ, জঙ্গল।

লাভার কথায় ফিরে আসি। সস্ত্রীক লাভার অদূরে কোলাখামে থেকেছি অনেকবার। সেসব স্মৃতিকথন বড়ই মধুর। তবে আমার লাভাতে প্রথম গমন জৈষ্ঠ্যের দাবদাহে। ধুতি আদ্দির পাঞ্জাবি পরে। ডুয়ার্স বাস আড্ডা থেকে সরাসরি লাভা যাওয়ার বাস ছিল হিমগিরি। এখনও আছে। ছাড়ে মিত্তল বাস টার্মিনাস থেকে। পৌঁছতে সন্ধ্যা। বন্ধু সুখেন্দু তখন লাভা গেস্ট হাউস চালায়। লাভা থেকে হেঁটে রিশপ। একেবারে সুনসান। সমস্যা হল ঠান্ডার কামড়। সুখেন্দু বলে— 'ও গৌরীদা করেছেন কী? লাভাতে সারা বছর ঠান্ডা। শীতে ভয়ংকর, দার্জিলিঙের চেয়ে বেশি। বাধ্য হয়ে সুখেন্দুর প্যান্ট-শার্ট, জ্যাকেট, টুপি

আরেকটি শতবর্ষ প্রাচীন সাংসের সিনকোনা বাংলো। কদাচিৎ কোনও পথ ভোলা পথিক এখানে আসেন। অনেকে খোঁজই রাখেন না। পাশেই সুসজ্জিত সাংসের হোমস্টে। কালিম্পং থেকে ডেলো দর্শন কিংবা একদিন কাটিয়ে অনায়াসে চলে আসুন সাংসের। তারপর ইচ্ছেগাঁও। তারপর যেখানে ইচ্ছে যান। তারপর আলগাড়া, লাভা। রাস্তা খুবই খারাপ। লাভা যাবার পথ খুবই ঘিঞ্জি। লাভা থেকে এবরো খেবরো পথে সোমাবিয়াং চা-বাগান হয়ে ঝান্ডি।

পড়ি। রাতে রুমহিটার। সুখেন্দুর শ্বশুরবাড়ি কোলাখামে, অনেক নিচে। বিয়ে করেছে বুদ্ধিমতী ইন্দিরাকে। সে সময় কোলাখামে কোনও রিসর্ট, লজ, হোমস্টে কিছুই ছিল না। এখন অনেক লজ রিসর্ট গজিয়ে উঠেছে। সেসব নিয়ে মন্তব্য করতে চাই না। পরিবর্তন জগতের নিয়ম।

কোলাখাম থেকে গরুবাথান। কেউ কেউ বলে সোমবাড়ি। কারণ সোমবারে সুবিশাল হাট বসে। গরুবাথানের পাশে চেল নদী পার হলে পাথরঝোরা। আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা সেখানে থাকে। সেসব নিয়ে অনেক পাঁচালি ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখেছি, তাই বিরত থাকছি। তবে গরুবাথানের কাঠের পুরাতন বনবাংলোর বিস্তর স্মৃতি এখনও যেন চক্ষুপটে ভেসে ওঠে। ডামডিম থেকে রানিচেরা, মিনগ্লাস, সাঁইলি হয়ে ভুট্টাবাড়ি চা-বাগান আদিবাসীদের ঘরগেরস্থালী। ফৌজি-ব্যারাক, হাটবাজার। গরুবাথান থেকেই চড়াই পথ একটু এগলে ডানদিকে থানা, হাসপাতাল, বনবাংলো। অনিন্দ্যসুন্দর বনবাংলোতে থাকার আনন্দঘন অনুভূতি আজ শুধু অন্তরে। রাজনীতির ডামাডোলে পুড়ে ছাই বাংলোটা। কয়েক বছর আগে নির্মল হুদাতি শিলিগুড়ির বাড়িতে এসে বলে, 'স্যার চলুন আমার ওখানে আপনি ও বৌদি দুজনে। ঘোরা-বেড়ানোর ব্যবস্থা আমি করব। কবে যাবেন স্থির করুন। বর্ষা বলেই একটু ইতস্তত করছিলাম কিন্তু অত সাতপাঁচ ভেবেচিন্তে বেড়ানো যায় না। গিন্নিকে বললাম, চলো যাই নির্মল অনেকদিন থেকে বলছে। এক জায়গায় কতবার যাব? তা হোক। নির্মল যথারীতি গাড়ি নিয়ে হাজির সকালে। গন্তব্য গরুবাথান। যেতে যেতে নির্মল কাঠচোর, বন্যপ্রাণীদের সংকট, উত্তপ্ত রাজনৈতিক কেচ্ছাকাণ্ড বলতে থাকে। মিনগ্লাসে গাড়ি দাঁড় করায়। কী ব্যাপার? 'স্যার একটু মাছের খোঁজ নিই কারণ বৌদি ডিম, মাংস কিছুই খান না। আপনাকে নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। সর্বভূক।' গিন্নি যত না না করে নির্মল কর্ণপাত না করে হাটের হট্টগোলে মিশে গেল। দেদার শুয়োরের মাংস। হাড়িয়া পানের আসর বসে গেছে। ওমা হঠাৎ দেখি ভুট্টাবাড়ির কাছে পৌঁছাতেই ঝমঝম করে বৃষ্টি নামতে শুরু করে। বৃষ্টির মধ্যে দুই ঘরের ছোট্ট বাংলোয় পৌঁছে যাই। বাংলোর কুক-কাম চৌকিদার ভুজেল ছাতা নিয়ে ছুটে আসে। নির্মল চলে গেল; ওর কোয়ার্টার একটু নিচে। ভুজেল বলে— 'আপনাদের জন্য চা করে আনি। তারপর রান্নাবান্না। কয়টায় খান আপনারা?' —দুটোর আগে নয়। নিশ্চিন্তে রান্না করো। দরকার হলে কাকিমা রান্নাঘরে ঢুকে পড়বেন। নো প্রবলেম।

বৃষ্টি কমলে নির্মল এল, —স্যার দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বের হব। গেছেন অনেকবার আমার সঙ্গে তো যান নি। কোথায়? সাকাম। ঠিক আছে। পুরনো পরিত্যক্ত বনবাংলোটা দেখে বড় কষ্ট হল। কিছুই করবার নেই। সবই মেনে নিতে হয়। চমৎকার রান্নার হাত ভুজেলের। খেয়েদেয়ে দুজনে একটু গড়াগড়ি দিতে না দিতেই নির্মল গাড়ি নিয়ে হাজির, 'স্যার, চলুন বেরিয়ে পড়া যাক।' সেই পুরনো পথ। বুড়িখোলা, বৃষ্টিস্নাত অরণ্য। মাল নদী, বাঁ দিকে সাকাম বিট। সাকাম থেকে ঘুরে বেড়িয়ে মিশন হিল চা-বাগান, লোয়ার ফাগু, ফাগু বাংলো, গরুবাথান কলেজের পাশ দিয়ে ফিরে আসি বাংলোতে। থানার চত্বরে ঢং ঢং করে পেটানো ঘণ্টায় ৬টা বাজল। ভুজেল আমাদের জন্য বসে ছিল। বললাম আজকে রাতে খিচুড়ি বানাও। নির্মলেরও তাই মত। ঘরে বসে মুড়িমাখা, পকোরা খাই, আড্ডা দিই। রাত্রি ন'টায় খিচুড়ি রেডি। অসাধারণ স্বাদে-গন্ধে। ভুজেলের হাতে জাদু আছে— গিন্নি বলল। ভুজেল বলে 'স্যার আর এক বছর। তারপর রিটায়ার। জানি না কী হবে।' রাত দশটার পর নির্মল চলে গেছে। যাবার আগে বলল, 'স্যার আগামীকাল কিন্তু সকালবেলা বেরিয়ে পড়ব ঝান্ডির উদ্দেশে। ওখানেই ব্রেকফাস্ট করব। খেয়াল থাকে যেন। আর ভুজেল আমার জন্য একটু বাসি খিচুড়ি রেখে দিও।'

গরুবাথান থেকে ঝান্ডি আপার ফাগুর পথ অসাধারণ। চেল নদীর সৌন্দর্য, ঝর্না, চা-বাগান, পিকনিক স্পট। বর্ষায় মধুময় চেলের দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকি। ঝান্ডির পথ মোটেও ভাল নয়। তবে প্রকৃতি ঝান্ডিকে সাজিয়ে রেখেছে।

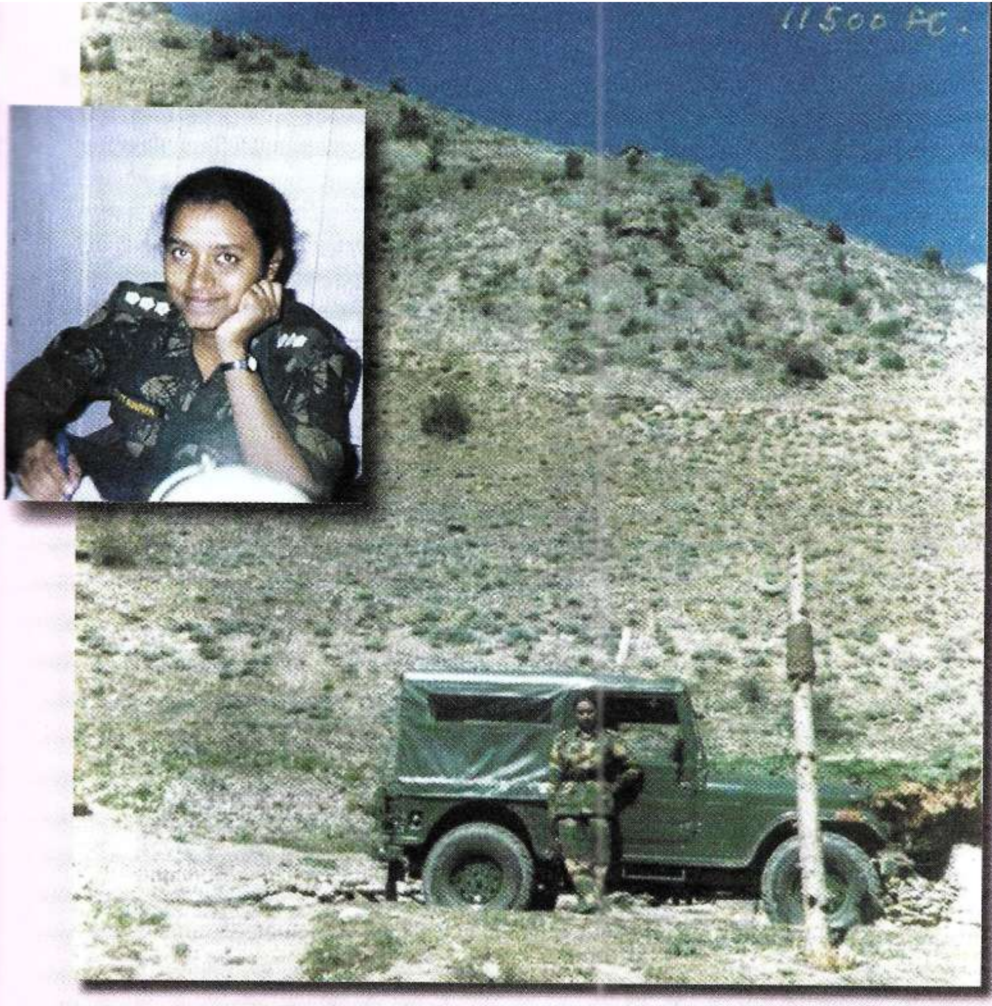

কার্গিল যুদ্ধ ফ্রন্টে একা বাঙালি কন্যা ছিলেন ডুয়ার্সের সুতনয়া

গৌরবময় স্মৃতিচারণ করলেন ডা. মেজর সুতনয়া মিত্র মজুমদার

কোনও কথা না বলেই চলতে চলতে পৌঁছলাম উধমপুর ট্রান্সিট ক্যাম্প। নর্দার্ন কমান্ডের হেড কোয়ার্টার, সেখানে প্রাতঃরাশ। হঠাৎ একঝাঁক সাংবাদিক হাজির। একাকী বঙ্গললনা চলেছি নাকি যুদ্ধক্ষেত্রে। সেকথা জেনে আমি রোমাঞ্চিত। জানতাম না আমি একা মেয়ে চলেছি হাজার হাজার ছেলের মধ্যে।

ঘন, ভারি, অন্ধকার গভীর রাত। অজানা গাম্ভীর্যে বাতাস ভারি। দৃঢ়তা, সাহস, বীরত্ব সব মিশে একসাথে। আসন্ন, বিগত ও ক্রমবর্ধমান ক্ষয়ক্ষতি, তাজা প্রাণ, তরতাজা রক্ত ইত্যাদিতে থম মেরে থাকে চারপাশ।

জম্মু ট্রান্সিট ক্যাম্প থেকে চলেছি নতুন ইউনিট-এ যোগ দিতে। নিউজলপাইগুড়ি থেকে লোহিত এক্সপ্রেসে জম্মুতে এসেছি দুপুরবেলায়, একখানা বড় মিলিটারি ট্রাঙ্ক নিয়ে, তাতে লেখা নেই কিছু। শুধু আমার নাম। যেতে হবে প্রত্যন্ত গ্রাম দ্রুগমুল্লায়, কুপওয়ারা জেলায়। সেখানকার সেনা হসপিটাল হবে আমার ঠিকানা। এর আগে জরুরি ট্রেনিং শেষ করেছি লক্ষ্ণৌতে, গ্রীষ্মের দাবদাহে। শিক্ষা ও অনুশীলন চলাকালীন আমরা মেতে উঠেছিলাম বিশ্বকাপ ক্রিকেট নিয়ে। সেই হুল্লোড় হৈ হৈ-এর মধ্যে পাকিস্তান ঘাপটি মেরে প্রতিবেশী দেশে ঢুকে বসেছে। অতএব আমরাও সচকিত। হাইকমান্ড, হেড কোয়ার্টার সচকিত। আমাদের পরিবার উৎকণ্ঠিত।

সময়টা ছিল কার্গিল যুদ্ধ শেষ হওয়ার ঠিক দু'মাস আগে। বন্ধুরা মিলে লক্ষ্ণৌতে ট্রেনিং সেন্টারে কফি, স্ন্যাক্স আর স্যুপের আড্ডায় বসে আলোচনা করি, আমরা যারা কুপওয়ারা চলেছি, নিশ্চয়ই প্রতি সন্ধেবেলা একসাথে কফি শপে এরকম একটা আড্ডায় বসব। কিন্তু কে জানত আমাদের এ ধারণা সর্বৈব মিথ্যা কতটা! কোথায় শহর, কোথায় সন্ধে, কোথায় কফি! শুধু ছিল নিঝুম হলুদ দুপুর, চকচকে চিনার পাতা, একাকী ধানখেত, অসহায় পীরপাঞ্জাল, গড় গড় আওয়াজে চলে যাওয়া বফর্স কামান। হঠাৎ হঠাৎ গোলার আওয়াজ, মিনমিন করে নেমে আসা সন্ধেবেলা, ঘর অন্ধকার করে চুপটি বসে থাকা যাতে মিসাইলের আক্রমণ না হয় ঘরের আলো লক্ষ্য করে। আর, যখন ডাক পড়ত, চুপচাপ সবাই হাজির হতাম হাসপাতালে, নীরব ও যান্ত্রিক আমরা তৈরি আহত ও নিহতদের জন্য। হঠাৎ কেমন করে যেন পুরো প্রাঙ্গণ ভরে উঠত অগুনতি সৈন্যদলে। আহতরাও আর্তনাদ করে না, এমনই অনুশীলন।

ফিরে যাই জম্মুর রাতে। নাম লেখা ট্রাঙ্কসহ আমি, সঙ্গে বাবা-মা। ১৯৯৯। যখন চলেছি, কারুর পরিবার যেতে পারছে না সঙ্গে। গ্রীষ্মের ছুটিতে কাশ্মীর উপত্যকা সবার স্ত্রী-সন্তানে ভরপুর হয়ে ওঠে। শুধু দুটি মাস। কিন্তু এ বছর বাধা। তবুও আমার অদমনীয় বাবা-মাকে নিতে হবে সঙ্গে। আমি টেলিগ্রাম পাঠালাম কমান্ডিং অফিসারের কাছে। অদ্ভুত কাণ্ড, উনি অনুমতি দিয়েও দিলেন! আমি তো নিশ্চিন্ত ছিলাম, এ আবদার কেউ মানবে না আর আমাকেও নিয়ে যেতে হবে না বাবা-মাকে। আমি চাইছিলাম না যে ফেরার পথে তাঁরা আমার জন্যে কোনও অশান্তি কিংবা দুশ্চিন্তা নিয়ে ফিরুন।

রাতের খাওয়া শুরু হল ক্যাম্পের অফিসারদের মেসে সন্ধে সাড়ে সাতটায়। সদ্য তরুণদল বলিষ্ঠ নীরবে ও দৃঢ়তায় ডিউটি শেষ করছে নৈশভোজন করে, একের পর এক।

সবাই চলেছি ফরওয়ার্ড পোস্ট-এ। এখান থেকে শ্রীনগর, তারপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে যে যার প্রত্যন্ত ইউনিটে। সবাই লাইন অফ কন্ট্রোলের পাশে। বাবা-মাকে নিয়ে ঘরে এলাম। ভোর তিনটের সময় কনভয় শুরু করবে যাত্রা।

রাত আড়াইটে। মৃদু আওয়াজ দরজায়। ক্যাম্পে ডিউটিরত জওয়ান দাঁড়িয়ে, হাতে থার্মোফ্লাস্কে চা। আমরা তৈরি। সামনের প্রাঙ্গণে নীরবে 'ফল-ইন' হল। সেদিনকার কনভয় কমান্ডার যিনি, তিনিই করলেন সবার 'গিনতি'। নীচু আওয়াজে আমরা সাড়া দিলাম। নিকষকালো রাত যেন মাথার ওপর ভার নিয়ে ঝুলে আছে। অদ্ভুত চাপ মনের মধ্যে। আমাদের জন্য নির্দিষ্ট বাসে আমরা উঠেছি। প্রথা অনুযায়ী, আমি জুনিয়র অফিসার হিসেবে চললাম পেছনের দিকে বসতে। কিন্তু কনভয় কমান্ডার, সিনিয়রমোস্ট অফিসার, উনি বললেন, আমার বাবা-মা, যাঁরা ওখানে সবচেয়ে সিনিয়র, তাঁরাই সামনে বসবেন। সসম্মানে তাঁদের সবচেয়ে ভাল আসন দেওয়া হল। চলল আমাদের কনভয়, সব যান একের পর এক। কিউ.আর.টি. বা কুইক রিইয়্যাকশন টিম, কালো ফেট্টিতে মুখ ঢাকা, বুলেট প্রুফ জ্যাকেট ও হেলমেট পরা, মেশিনগান নিয়ে সবচেয়ে সামনে, সম্পূর্ণ কনভয় রক্ষায়। একদম পেছনেও কিউ.আর.টি., মাঝখানের যানগুলিতেও সশস্ত্র সৈন্যরা। নিষ্কম্প নিঝুম ঘন অন্ধকারের চাদর মোড়া পৃথিবী। শুধু আমরা চলেছি। কথা নেই। অজানা অশান্ত দুনিয়ার দিকে চলেছি সবাই।

ধীরে ধীরে বাইরের কালো রঙে জল মিশল। রাস্তার বাঁকে বাঁকে চোখে পড়ল সশস্ত্র সৈন্যরা নির্দিষ্ট দূরত্বে দাঁড়িয়ে, রাস্তার দিকে পিঠ দিয়ে। নতুন সব দৃশ্য। সবার মধ্যে অদ্ভুত সচকিতভাব, সতর্কতা কিন্তু অনড়। চালক ঋজু, দৃষ্টি সজাগ। ওই যারা রাস্তায়, পথের বাঁকে বাঁকে দাঁড়িয়ে, তাদের বলে আর.ও.পি. (রোড ওপেনিং পার্টি)। ভোর রাতে মাইন সুইপার রাস্তা পরীক্ষা করতে করতে চলে, আর এভাবে পথ খোলা থাকে সেনাবাহিনীর চলাচলের জন্য। সন্ধে নামার মুখে আবার সেই গাড়ি আসে, সারাদিনের প্রহরায় থাকা সেনানীদের তুলে নিয়ে ফিরে যায় ক্যাম্পে। রোড ক্লোজিং পার্টি তখন তারা। এরপর আবার আর.ও.পি. না আসা পর্যন্ত সেনাবাহিনী চলাচল করে না। অনুমতি নেই। যদি নিতান্তই জরুরি হয়, তখন আছে আমাদের 'ক্যাসপার'। ল্যান্ড মাইনের ওপরে চললেও, ওলটপালট হয়ে যাবে কিন্তু ভেতরে শক্ত বেঁধে বসা সেনানীদের ক্ষতি খুব একটা হবার নয়।

কোনও কথা না বলেই চলতে চলতে পৌঁছলাম উধমপুর ট্রান্সিট ক্যাম্প। নর্দার্ন কমান্ডের হেড কোয়ার্টার, সেখানে প্রাতঃরাশ। হঠাৎ একঝাঁক সাংবাদিক হাজির। একাকী বঙ্গললনা চলেছি নাকি যুদ্ধক্ষেত্রে। সেকথা জেনে আমি রোমাঞ্চিত। জানতাম না আমি একা মেয়ে চলেছি হাজার হাজার ছেলের মধ্যে। বাঙালি সাংবাদিকও ছিলেন। পরে পড়েছি তাঁদের রিপোর্ট স্টেটসম্যান ও অন্য পত্রিকায়।

আবার যাত্রা। অপরূপ পথ ধরে চলে আমরা বিকেলে এলাম শ্রীনগর ট্রান্সিট ক্যাম্প। বিশাল তার ব্যাপ্তি, অপূর্ব সজ্জিত সবুজে, ফুলে ফলে। লালচে হলুদ পড়ে আসা গোধূলি। একের পর এক বাস আসছে। নামছি আমরা। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল একজন ডাক্তার বন্ধুর সাথে। বাঙালি ছেলে, একসাথে লক্ষ্ণৌতে ট্রেনিং করেছি আমরা।

এবার আমার গন্তব্য দ্রুগমুল্লা গ্রামে, আমার নির্দিষ্ট হসপিটালে। সকাল থেকে সারাদিনের যাত্রা। সন্ধেবেলায় নৈশভোজ সেরে বেরিয়ে এদিক ওদিক ঘুরছি। বেশ ভিড়। সবাই চলেছে অ্যাকশানে। হঠাৎ দেখি একটি কাঠের ছোট্ট কেবিন। ভেতরে কালো ফোন, বাইরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষারত সবাই। কিন্তু কেউ অস্থির বা বিচলিত নয়। অধৈর্যও নয়। সেদিন আমার সাথেই ছিলেন আমার দুই সবচেয়ে নিকটজন, তাই আমার কোনও তাড়া ছিল না। কিন্তু পরে সেই কাঠের খোপটিই হয়ে উঠেছিল সবচেয়ে কাঙ্খিত বস্তু। একবার হাত রাখো ওই কালোতে,

ভোরবেলায় দরজায় ডাক। এক বিশালদেহী সর্দারজী। গুরুদোয়ারা থেকে আমাদের জন্য বিশেষ চা এনেছেন। মালাই ও এলাচে ভরপুর। প্রথা মেনে। উনি জওয়ান। আমি অফিসার। কিন্তু কাল যখন এসেছি, দূর থেকে নাকি আমাকে তাঁর কন্যার মত লেগেছে, সে পাঞ্জাবে গ্রামে রয়েছে। তাই আজ ভোরবেলায় হাজির।

কানের মধ্যে দিয়ে প্রিয় মানুষেরা ঘিরে ধরত নিমেষে। আকুলতা, ব্যাকুলতা, আনন্দ, দুঃখ সব একসাথে একাকার।

নিশ্চিন্তে ঘুম হল সে রাতে সুন্দর বিছানায়। ভোরবেলায় দরজায় ডাক। এক বিশালদেহী সর্দারজী। গুরুদোয়ারা থেকে আমাদের জন্য বিশেষ চা এনেছেন। মালাই ও এলাচে ভরপুর। প্রথা মেনে। উনি জওয়ান। আমি অফিসার। কিন্তু কাল যখন এসেছি, দূর থেকে নাকি আমাকে তাঁর কন্যার মত লেগেছে, সে পাঞ্জাবে গ্রামে রয়েছে। তাই আজ ভোরবেলায় হাজির। পরে আর কখনই দেখা হয় নি ওঁর সঙ্গে। নরম রোদে ডাইনিং হলের বাইরে কচি সবুজ লতানো ঝোপ, বাগানে আধো ছায়া, ভেজা ভেজা ঘাস সবই জ্বলজ্বল করছিল। বুট জুতো ক্যামোফ্লেজ পরে আমরা ভেজা ঘাস পেরিয়ে হাঁটছি মশ্‌মশ্ শব্দে। তখন আমি আমার আভ্যন্তরীণ পেলবতার ওপর বাহ্যিক দৃঢ়তার আভরণ পরেছি। সবাই ডিটারমিনেশনে ভরপুর। বিশাল প্রাঙ্গণে অপেক্ষারত যান, সারিবদ্ধ সেনাদল।

বাবা-মা ও আমি, পৌঁছে গেলাম দ্রুগমুল্লা গ্রামে। ঠিক আমাদের হসপিটালের গেটের সামনে। পুরো তিন আনাড়ি অবাক চোখে দেখছি এদিক ওদিক। এসে গেল আমার একটু সিনিয়র, তাঁকে পাঠিয়েছেন কমান্ডিং অফিসার, আমাকে 'বরণ' করতে। হ্যাঁ, এ কাজ আমিও করেছি পরে অনেক। অসাধারণ এক তৃপ্তি হত মনে, পরিবারের নতুন সদস্যকে বরণ করতে। আর্মিতে পরিবারের সদস্যদের এবং বয়স্ক ও মহিলাদের যে অপার সম্মান ও আদর দেওয়া হয় সে আমি কোথাও দেখি নি। আমাদের জন্য গেস্টরুমে ব্যবস্থা করা ছিল। বাবা-মা সেখানে রইলেন। আমি অবশ্য আমার জন্য নির্দিষ্ট যে ব্যারাক, সেখানে ঘাঁটি গাড়লাম। পরে রাতে অবশ্য বাবা-মাও এসে শুলেন আমার ব্যারাকে। সামনে ব্যাডমিন্টন কোর্ট, বাগান, অফিসার্স মেস যেখানে খাওয়া, গল্প, টিভি আর চারপাশে অফিসারদের ব্যারাক। পেছনে অন্যদের। আমার ঘরের পাশে ছিল ভুট্টাখেত। সেসব খেতে নাকি টেররিস্টরা লুকিয়ে থাকে। রাতে আলো জ্বলে না ঘরে, নিষেধ, যদি মিসাইল আক্রমণ হয় আলো লক্ষ্য করে। কমান্ডিং অফিসারের আদেশে আমার নামে ছোট একটি আগ্নেয়াস্ত্র ইসু করা হয় 'কোত' থেকে, আত্মরক্ষার্থে। সে রাতে একজন অফিসারের 'হ্যাপি বার্থ ডে' ছিল, পার্টি হল, সবাই অ্যালার্ট, তারই মধ্যে। সে এক অদ্ভুত জীবন শুরু। কিছু কিছু বুঝছি, মজা হচ্ছে, আবার ভয়, শিহরণ, রোমাঞ্চ।

রাত কাটিয়ে বাবা-মা পরদিন রওনা হলেন শ্রীনগর। কনভয়ের সামনে তাঁদের ছাড়তে দাঁড়িয়ে আছি। মা একটু পিঠে হাত দিয়ে বললেন, মাথায় খুসকি হয়েছে রে। আমি বললাম, "মা, এখানে সবাই সৈন্য, বাড়ি পরিবার ছেড়ে..."। মানে, সবার সামনে আবেগকে রোধ কর, বধ কর। কচি তরুণেরা বাসের জানালায় গাল লাগিয়ে দূরে কোথাও দেখছে। কোন শূন্যতায়? অসীম কোথাও? কে কোথায় চলল, ক'জন ফিরেছে, মায়েরা পিঠে তাদের হাত বুলিয়ে দিয়েছেন কিনা কে জানে!

বাবার কোনও কথা বলার অবস্থা ছিল না। ওঁদের যত্ন করে বসিয়ে দিল আমাদেরই এক সৈনিক। কনভয় চলল, ধীরে ধীরে, অস্ত্র-সজ্জিত হয়ে। তার মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় দু'জন। আজ ভাবি, কীভাবে ওঁরা আমাকে ওখানে রেখে যেতে পারলেন! ছোটবেলা থেকে এতগুলো বছর দু'জনে যেভাবে আগলে রেখেছেন আমায়— ওঁরাই তো সবচেয়ে বড় যুদ্ধজয়ী।

রাতে অন্ধকার ব্যারাকে শুয়ে আমি, একা। মাথার কাছে জানালার ওপাশে খচখচ শব্দ। চোখ এবং হাত আগ্নেয়াস্ত্রে। আমার আশঙ্কাময় কল্পনা ডানা মেলেছে, সেখানে টেরোরিস্টরা। এই উত্তেজনায় সে রাতে মাইগ্রেনের ব্যথা শুরু হল অসহ্য। ভোররাতে ঘুম এল। পাতলা ঘুম। হঠাৎ ছোট আওয়াজ, বাথরুমের দরজায় ছোট্ট ক্যাঁচক্যাচ, তারপর ঠিক যেন মায়ের হাঁটার শব্দ পেলাম। আহ্, একদম যেন মায়ের গায়ের গন্ধ! চমকে ঘুম ভেঙে গেল ঠিকই কিন্তু মনটা বড্ড খারাপ হল, কারণ মা যে মিলিয়ে গেলেন! ইচ্ছে করছিল ডুকরে ডুকরে কাঁদি। কিন্তু না, না কেঁদে, ইউনিফর্ম পরে তৈরি হয়ে সোজা কমান্ডিং অফিসার এর অফিসে, অদ্ভুত নিবেদন নিয়ে। দিল্লিতে কথা বলব স্যর। মায়ের সঙ্গে। কিচ্ছু না বলে তিনি কেবল মুচকি হেসে অনেক কায়দা

করে যোগাযোগ স্থাপন করে দিলেন মামার বাড়িতে। আমি কান্না চেপে শুনলাম মা বলছেন, "এখানে আমরা খুব হৈহৈ করছি"। মা উচ্ছ্বসিত। আমি কান্নাকে রোধ নয়, বধ করা অনুশীলন করছি তখন, ঠিক যেভাবে শিখিয়েছিলাম মাকে।

আমার নতুন জীবনযাত্রা শুরু। এই যাপন-পথে আমি ভারতবর্ষের সেই সব সেনানীদের সঙ্গে কাটিয়েছি যাঁরা তাঁদের জীবনটাই উৎসর্গ করে দিয়েছেন দেশের কাজে। আজই যাঁর সঙ্গে কথা বললাম, হাসি বিনিময় করলাম কালই হয়ত তাঁর নিথর দেহ চলে এল হসপিটালের ক্যাম্পাসে। এরকম যে কতবার ঘটেছে তার ঠিক নেই। মনটা বড্ডই খারাপ হয়ে যেত। আবার বুঝেও গিয়েছিলাম যে এমনটাই স্বাভাবিক।

আমি ১৯৯৯-এর মে মাসে দ্রুগমুল্লায় জয়েন করেছি, সে বছরই আগস্ট মাসে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। এই দু'মাসে যা যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তা আমি এ প্রোফেশনে না থাকলে হয়ত বুঝতেই পারতাম না কোনওদিন। সব মিলিয়ে দু'বছর ছিলাম ওখানে। কত যে অভিজ্ঞতা ঝুলিতে পুরেছি তার কোনও হিসেব নেই।

আমি যে হসপিটালের দায়িত্বে ছিলাম সেখানে প্রতিদিনই কোনও না কোনও আহত সৈন্যকে নিয়ে আসা হত চিকিৎসার জন্যে। আমি তো সবেমাত্র এসেছি এই জীবিকায়, ফলে আমার মধ্যে নানান রকম আবেগ কাজ করত সে সময়। খুব কষ্ট পেতাম তাঁদের দেখে। ধীরে ধীরে বুঝতে শিখলাম যে এটি অত্যন্ত স্বাভাবিক এখানে। মানিয়ে নেওয়ার জন্যে অল্প সময়ের মধ্যে আমাকেও তৈরি হতে হবে।

গ্রামের স্থানীয় মানুষেরাও আমাদের কাছে ট্রিটমেন্টের জন্য আসত। ওদের দারিদ্র্য দেখলে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। গায়ে বিকট গন্ধ। খেতেই পায় না ঠিকঠাক তো সাবান কোথায় পাবে! ইন্ডিয়ান আর্মির ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল ওরা। বিশেষ করে চিকিৎসার ব্যাপারে। প্রাথমিক চিকিৎসা করাতে তো আসতেই হত। আশ্চর্যের বিষয় বেশিরভাগই আসত সারা শরীরে ব্যথা নিয়ে। এসে বলত, 'সর্সিপানাশ সখ দোত', মানে সারা শরীরে ব্যথা। ওদের আমরা আউটডোরেই দেখতাম। ওদের ঘরে টেররিস্টরা শেলটার নেয়। ফলে ওষুধ কালেক্ট করার জন্যেই আসত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। আমরাও ওপর ওপর দেখে কিছু একটা সামান্য ওষুধ লিখে ছেড়ে দিতাম। এখন ভাবি, বিশ্বাসের জায়গাটা বড়ই টলমল দেখেছি সেসময়, যদিও এর কোনও বিকল্প নেই। সহানুভূতি থাকলেও তা দেখানোর কোনও জায়গা নেই। আবেগের বশে একটা ছোট্ট সিদ্ধান্ত আমার দেশকে কঠিন বিপদের সম্মুখীন করে দিতে পারে।

আহত সৈনিকদের প্রাথমিক আস্ত্রোপচারের পর প্রায়োরিটি অনুযায়ী একে একে কিংবা একসাথে, হেলিকপ্টার কিংবা কনভয়ে, শিফট করানো হত শ্রীনগর বেস হাসপাতালে। আমি বহুবার আমাদের হেলি 'চিতা'তে আহত জওয়ান নিয়ে গেছি। ওখানে মিসাইলের প্রাবল্য বলে খুব লো ফ্লায়িং হত, গাছগুলির মাথার ওপর ওপর দিয়ে। নীচে গ্রামের উচ্চকিত বালক বালিকারা ছুটছে, হাসছে, হাত নাড়ছে আর আমরা কঠিন পরিস্থিতির গন্তব্যের উদ্দেশে উড়ছি।

একবার একটুর জন্যে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলাম মানব-বোমার হাত থেকে। হয়েছিল কী, শ্রীনগর ক্যান্টনমেন্টে গিয়েছিলাম একজনের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর দেখা না পেয়ে বড় গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবলাম, থাক্ পরে আসব। যেই সরেছি তার কয়েক মিনিটের মধ্যে দেখলাম আমার পেছনে বিশাল একটা আওয়াজ আর সেই সঙ্গে কালো ধোঁয়ায় ভরে উঠেছে ক্যান্টনমেন্টের সামনের আকাশ। কী হল? একটা লাল মারুতি নাকি ভয়ঙ্কর গতিতে এসে সোজা ঢুকে গেল গেটের মধ্যে, একেবারে ভেতরে। অনেকে জখম তো হয়েছিলই, এমনও দেখা গেল যে মানব-বোমার শরীরের ছিন্নভিন্ন অংশ থেকেও আহত হয়েছিল অনেকে। হাড়ের টুকরো, দাঁত এসব দিয়ে। ভাবলেও গা শিউরে ওঠে এখন, যে, মাত্র কয়েকটা মিনিটের জন্যে আমি বেঁচে গিয়েছিলাম সেবার। দুপুরের খবরে চলে এল সে সংবাদ। ফলে বাড়িতে বাবা-মা, যাঁরা জানতেন যে আজ আমার ওখানেই থাকার কথা, তাঁদের অবস্থা অনায়াসেই কল্পনা করে নেওয়া যায়। আমিও বুঝলাম যে ওঁদের শান্ত করা দরকার। তখন যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনকার মত নয়, ফলে অনেক কসরত করে বাড়িতে আমার জীবিত থাকার খবরটা পৌঁছোনো গেল শেষমেশ।

রাতে অন্ধকার ব্যারাকে শুয়ে আমি, একা। মাথার কাছে জানালার ওপাশে খচখচ শব্দ। চোখ এবং হাত আগ্নেয়াস্ত্রে। আমার আশঙ্কাময় কল্পনা ডানা মেলেছে, সেখানে টেরোরিস্টরা। এই উত্তেজনায় সে রাতে মাইগ্রেনের ব্যথা শুরু হল অসহ্য। ভোররাতে ঘুম এল। পাতলা ঘুম। হঠাৎ ছোট আওয়াজ, বাথরুমের দরজায় ছোট্ট ক্যাঁচক্যাচ, তারপর ঠিক যেন মায়ের হাঁটার শব্দ পেলাম। আহ্, একদম যেন মায়ের গায়ের গন্ধ! চমকে ঘুম ভেঙে গেল ঠিকই কিন্তু মনটা বড্ড খারাপ হল, কারণ মা যে মিলিয়ে গেলেন! ইচ্ছে করছিল ডুকরে ডুকরে কাঁদি।

জর্জ ফার্নান্ডেজ, তৎকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এসেছেন কুপওয়ারাতে, বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমরা পৌঁছেছি র‍্যালিতে। ওঁর সাথে কথা নিম্বুপানির সাথে সাথে, একটি মনোরম অভিজ্ঞতা। সেদিনই আমরা আরও অনেক বন্ধু বানিয়েছি, বিভিন্ন ইউনিট থেকে জড় হওয়া ইয়ং অফিসারস। দুপুরে খুশি খুশি মনে ফিরতেই খবর এল খানিক আগেই আতঙ্কবাদীদের হামলা ও গোলা যুদ্ধে আমাদের কিছু সেনা নিহত ও আহত। তাদের নিয়ে আসা হচ্ছে, আমরা প্রস্তুত। দেখি, সেদিনের একমাত্র নিহত বীর, সদ্য কমিশনড তরুণ, যার সঙ্গে আমাদের সেদিনই কত গল্প, মজা হল সামোসা জিলিপি সহযোগে। এমন ঘটনা প্রায়ই হয়েছে। চেনা মুখ, প্রিয় বন্ধু, একেকদিন তারা নিথর শুয়ে মর্গের বিছানায়, এক এক করে বুলেটের প্রবেশ-প্রস্থান গুনে চলেছি যখন, তখনও সেই সব ক্ষত থেকে তাজা গরম রক্ত বেরিয়ে আসছে। আজ সব দুঃস্বপ্ন মনে হয়।

আমি নাকি টলমল পায়ে প্রথম হাঁটতে শিখেছি কাশ্মীরের মুঘল উদ্যানে। তখন আমি এগার মাস। সে তো আর আমার মনে নেই, মনে থাকবার কথাও নয়, তাই খুব ইচ্ছে ছিল আবার কখনও যাব। কিন্তু কর্মসূত্র সে সুযোগ আমাকে আর দেয় নি। মুঘল গার্ডেনেও না, শিকারা হাউস বোটেও না। বরং কোণে কোণে, এলওসির পাশে পাশে আমার ঝুলিতে কিছু অসম্পূর্ণতা, মনখারাপ, কিছু ভালোবাসার স্মৃতি ভরে রয়েছে।

একটি গল্প বলি। গ্রামের মানুষের রোজকার ভিড়ের মধ্যে একদিন এল শ্যামলা, আয়ত চক্ষু, অনাবিল হাসি ভরা ফতিমা। মোটেও সে স্থানীয়দের মত দেখতে নয়। তারা তো গোলাপি বর্ণ, বাদামি চুল, মুখ নামিয়ে চোখ তুলে তেরছা লাজুক হাসির ফিরানে ঢাকা ছেলেমেয়ে। বালিকা আমার হাত ছুঁয়ে কাছ ঘেঁষে বসল। ও বাঙালি। সম্ভ্রান্ত ঘরের, বাবার রাগের ওপর অভিমান করে ক্যানিং-এর কাছাকছি এক গ্রাম থেকে পালিয়ে কলকাতায়, সেখান থেকে দরদী মাসির চোখে, তারপর সবকিছু রঙিনের উদ্দেশে দিল্লির ট্রেন। এরপর ঘুম, ঘুম, ঘুম, সবশেষে কাশ্মীর। হত দরিদ্র একটি লোকের বউ হয়ে আসে এই গ্রামে। মুক্তি খুঁজে মরে, খেতে পায় না রোজ। খবর পায় এক মেয়ে ডাক্তার, তায় বাঙালি, এখানে এসেছে। হাজির। লিখে দিল ঠিকানা, চিঠি পৌঁছে যাবে বাবার কাছে। রোজ আসে খোঁজ নিতে, কোনও খবর এল কিনা। আমিও ঝাঁপিয়ে পড়েছি ওর উদ্ধার কার্যে। অনেক কিছুই বুঝি না তখন। ও তো ওখানকার বউ, কেন সে থাকবে না! যাইহোক, ক'দিন পরে আমাকে তলব হেড কোয়ার্টারে, স্থানীয়রা আমার ওপর ক্ষুব্ধ, আর্মির ওপরেও বিশ্বাস হারাতে বসেছে। এসব থেকে সরে আসতে হবে, আমার মাথার ওপর বিপদের খাঁড়াও নাকি ঝুলছে। নিজের বাবা-মায়ের কথা ভাবো আর আবেগে ভেসো না। ফতিমাকে আর দেখি নি কখনও। শুনেছি ওর বাবা নাকি খবর পেয়ে কুপওয়ারা পুলিশ স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে কন্যার দর্শন না পেয়েই ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

জিনাত দিদি আসত। সেও পশ্চিমবঙ্গেরই এক হতদরিদ্র ঘরের মেয়ে, স্বেচ্ছায় কাশ্মীরে আরেক হতদরিদ্র শ্বশুর-ঘর বেছে নিয়ে মনের আনন্দেই আছে। আমার জন্য কখনও মকাইয়ের আটা নিয়ে আসত, চোখ ভরা হাসি ছিল, মুখে মমতা। সেই বিশালদেহী সর্দারজী আর তার হাতে খুবানি বা মশলা চা, শুনশান গ্রামের রাস্তায় থেমে যাওয়া কনভয়ে অ্যাম্বুলেন্সে বসে থাকা আমাকে কুইক রিয়্যাকশান টিমের কালো ফেট্টির সুবেদার সাহেবের এনে দেওয়া কাঁচা সবুজ মাঠে ঝরে পড়া আপেল, শিখ ব্যাটেলিয়ানের আমার জন্য দুশ্চিন্তায় বাড়তি দুধ ঘি কিংবা তুষারপাতের সময় বুখারির কয়লা জোগাড় করে রাখা, হসপিটালের পাঁচিলে উঠে ওপাশের গ্রামের মানুষের বেছে বেছে আমার জন্যে দেওয়া মুরগি কিনে তরিঘরি আমার প্রিয় ডিশ বানিয়ে ফেয়ারওয়েল পার্টি করা, এইসব ভাল লাগা ভাল বাসা বেঁচে আছে অগুনতি স্মৃতির সঙ্গে। সবকিছুই আমাকে আবেগতাড়িত করে আজও। সদাসতর্ক বিনিদ্র সেনানীদের কথা ভাবলে আমার নাগরিক চোখে শান্তির ঘুম নেমে আসে যেন।

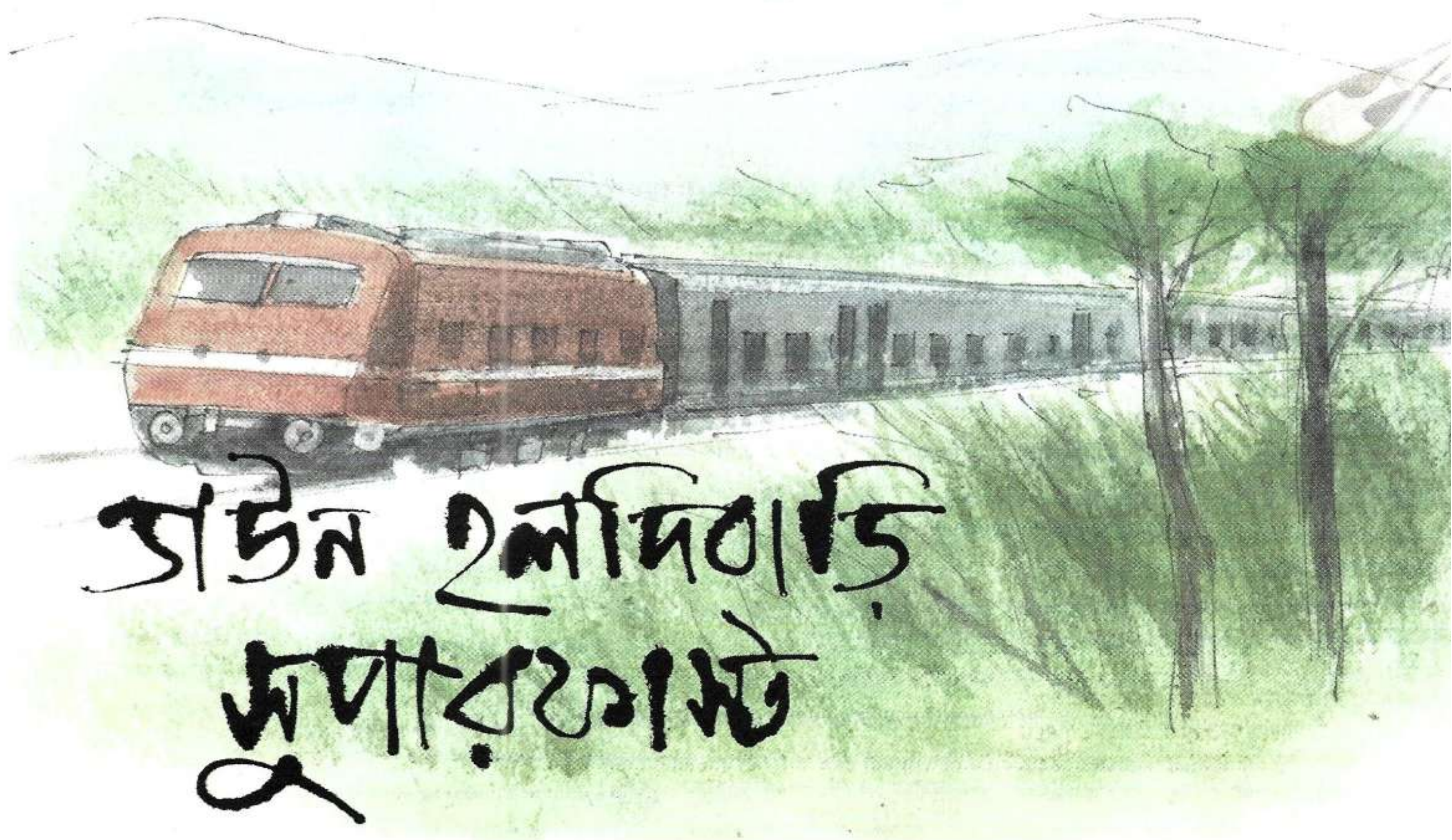

ডাউন হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট

সুজিত দাস

লিটিল ম্যাগাজিনের ইলা ব্যানার্জি, ফেসবুক বিপ্লবী ও সম্পাদক তথাগত রায়েরা নেমে গেছেন প্ল্যাটফর্মে। এলিট কম্পার্টমেন্ট থেকে এবার পা ফেলেছেন সুভাষ। সুভাষ ঘোষ ওরফে বাটা সুভাষ। ভিন্টেজ কার র‍্যালির অর্গানাইজার। অঙ্কে মাস্টার্স। তাঁর মাথায় এখন রাঙা পানির অ্যাসিড কারখানা। মংরা মাতালকে তাঁর চাই। ওদিকে মধুপুরে 'ট্রিপল আর'-এর জনসমাবেশ। ট্রিপল আর। রাধারানী রে। বিল্বমঙ্গল-সুহাসিনীর একমাত্র সন্তান। রাধারানীর শান্তিবার্তা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনল জনতা। গোম্বুর সঙ্গে লাটাগুড়ি রিসর্টে দেখা হল মংরা মাতালের। কিন্তু সে অতটা মাতাল নয় এবং তাঁর ভাল নাম ইন্দ্রাশিস। সাইবার ক্যাফে চালায়। এক বৃহত্তর প্ল্যাটফর্মে আপাত সম্পর্কহীন যাত্রীদের পরস্পরকে অদৃশ্য ওয়েবে জুড়ে দিচ্ছেন লেখক। বিভিন্ন সাবওয়ে দিয়ে তাঁরা দাঁড়াচ্ছেন রহস্যময় ট্রাফিকের সামনে। সিগন্যাল গ্রিন হচ্ছে। এবার কাহিনীর এইট লেন ট্র্যাকে পদার্পণ। মধুপুর ছেয়ে গেছে 'ট্রিপল আর'-এর বাসন্তী পতাকায়। তারপর?

৫।

সে অনেকদিনের কথা। তখনও এ তল্লাটে পাকা রাস্তার নাম ও নিশান ছিল না। বিকেলের দিকে তিস্তার চরে শেয়াল ডাকত। আর পি এফ ট্রেনিং সেন্টার গমগম করত নতুন রিক্রুটদের প্যারেডে। মোটমাট নতুনবাজার থেকে বাগজান অবধি এই ছোট্ট গঞ্জে হাঁকডাক লেগেই থাকত। সপ্তাহে দু'দিন হাট, রবি আর বুধ। এই দুটো দিন উৎসবের সময়। এই দুটো দিন দোমোহানি গ্রামে পাটের পাইকার, আড়তদার, দোকানি এবং হাটুরেদের ভিড়। সেই কতকাল আগে, এক বিকেলে, দোমোহানি মোড়ে নেমে একটা রিকশা ধরেছিল আমিন মিয়াঁ। বাঁ দিকে লাল শাড়ি পরা নতুন বিবি। ডাইনে আমিন মিয়াঁ নিজে। পায়ের কাছে একটা টিনের সুটকেশ। দিনটা বুধবার। সেদিন হাটবার ছিল। উপেন ডাক্তারের চেম্বার অবধি অজস্র চেনা চোখের কৌতূহলী দৃষ্টি সামলে নতুন বউকে নিয়ে পুরানবাজারে রজনীকান্ত দাসের বাড়ির সামনে রিকশা থেকে নামে আমিন মিয়াঁ।

রজনীকান্ত দোমোহানি গ্রামের প্রথম লক্ষপতি মানুষ। আমিন মিয়াঁ তাঁর পুরনো মুনিষ। গাই নিয়ে চরাতে বের হও রে, বেড়া বাঁধ রে, পোয়ালের পুঞ্জি

ঠিক কর রে, কালি ছাগলের দুধ দুইয়ে আন রে— আমিন মিয়াঁ এই বাড়ির ম্যান ফ্রাইডে। সেই আমিন হঠাৎ উধাও। উধাও তো উধাও। কয়েকবছর বাদে আবার ফিরে আসে আমিন মিয়াঁ। প্রতিবারই কিছু না কিছু একটা চমক সঙ্গে নিয়ে আসে। শেষ যেবার ফিরে এসেছিল এই সাতাশের যুবক, মৃত্যুর অনিবার্য গ্রাস থেকে নিজেকে কোনওমতে বাঁচিয়ে ফিরেছিল। মেটেলিতে নতুন ইস্কুলবাড়ি তৈরির সময় রাজমিস্ত্রির যোগানদারের কাজ করছিল আমিন। উঁচু বাঁশের ভারা থেকে পা হড়কে পড়ে গিয়েছিল যখন, বাঁচার কোনও আশা ছিল না। ছিন্নভিন্ন তলপেট, মাথায় গভীর ক্ষত। তবু বেঁচে গেল আমিন। কিন্তু মধুপুরের সদর হসপিটালে জটিল এক অপারেশন ওর শরীর থেকে কেড়ে নিল দুটো অণ্ডকোষ। প্রাণে বেঁচে আবার ফিরে এল আমিন মিয়াঁ। মুখে অনাবিল হাসি, হাতে টিনের সুটকেস। আবার মুনিষ জীবন। আবার আমিন মিয়াঁর রাতের বাঁশিতে সুরের খেলা। সিঙ্গিমারির রাস্তা আবার ভেসে যেত জ্যোৎস্না এবং সুরে। মিয়াঁর বাঁশিতে বড় মিঠে আওয়াজ।

পাঁচ বছর বাদে সেই আমিন আবার ফিরে এল। ফিরে এল নতুন বউ আর পুরনো টিনের সুটকেস নিয়ে। এবারে আর গোয়ালঘরের পাশে খড়ের ছাউনি দেওয়া ঘর নয়। নবদম্পতির ঠাঁই হল 'এল' প্যাটার্নের বারান্দা বরাবর শেষ টিনের ছাউনি দেওয়া ঘরে। আমিন আবার লেগে পড়ল পুরনো কাজে। আমিন মিয়াঁর বিবিও বহাল হয়ে গেল রসুইঘরে। রজনীকান্ত দাসের উঠোনে বনেদি কংগ্রেসি লোকেদের আনাগোনা। ইমার্জেন্সিও শেষ হওয়ার মুখে। চা-বিস্কুটের প্লেট এগিয়ে দিতে দিতে আমিন মিয়াঁ হাত না গুটিয়ে খদ্দরের পাঞ্জাবি পরতে শিখে গেল, রিকশার পেছনে মাইক হাতে নিয়ে স্লোগান দিতেও। গাই-বাছুরের ডিউটি ছেড়ে দেওয়ালে দেওয়ালে গাই-বাছুরের ছবি আঁকিয়ে হিসেবে নাম করে ফেলল আমিন, রজনীকান্ত দাসের অঘোষিত পার্সোনাল সেক্রেটারি। দোমোহানি গ্রাম ছাড়িয়ে ময়নাগুড়ি, ক্রান্তি এমনকী চ্যাংরাবান্ধা অবধি বহু দেওয়াল ছেয়ে গেল আমিনের আঁকা গাই-বাছুরে। দোমোহানি হাটে চোখের ওষুধ বিক্রি করত এক বুড়ো। হ্যান্ডমাইক হাতে নিয়ে দু-লাইনের বিজ্ঞাপন করে যেত, 'লাখ টাকায় মিলে না চক্ষু/ভাল করে সূর্য মার্কা নেত্রবিন্দু'। হ্যান্ডমাইক জিনিসটা বড় সরেস মনে হয় আমিনের। সামান্য যন্ত্র থেকে থেকে কত বড় আওয়াজ! কোনও এক রবিবার নতুনবাজারের হাটে, সূর্য মার্কা নেত্রবিন্দুর রিকশায় উঠে, বুড়োর হ্যান্ডমাইক হাতে নিয়ে ছোটখাট পথসভা করে ফেলে আমিন। ততদিনে সে আমিন মিয়াঁ থেকে জনাব আমিনুদ্দিন আনসারি, এলাকার পরিচিত কংগ্রেসি মুখ। ততদিনে আমিন শিখে গেছে 'ইন্ডিয়া মানে ইন্দিরা/ইন্দিরা মানে ইন্ডিয়া'। ততদিনে আমিন বড় নেতাদের ডাকনামে ডাকতে শিখে গেছে। ততদিনে ডিপি রায়কে অনায়াসে মিঠুদা বলে সম্বোধন করে ফেলতে পারে সে। জলপাইগুড়ি কালেক্টরেট বিল্ডিং-এ ম্যাটাডোর ভর্তি লোক পেছনে নিয়ে ড্রাইভারের পাশে ধপধপে পাঞ্জাবি পরা আমিনের এখন বড় সুখের সময় হে।

আমিনের সুখের ভাণ্ড আরও উপচে পড়ে। নতুনবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমিনকে জিতিয়ে আনলেন বৃদ্ধ রজনীকান্ত দাস। আশি পার করা বৃদ্ধ জানেন ভেতরে ভেতরে একটা চোরা ঢেউ বয়ে চলেছে। নিজে আর কতদিন বাঁচবেন কোনও ঠিক নেই। উপেন ডাক্তারের ভরসায় একটা গোটা জীবন বয়ে গেল, রোগ ব্যাধি ছাড়াই। ইদানীং একটা হাতছানি তাকে ডাকতে থাকে সময়ে অসময়ে। রজনীকান্ত জানেন আমিন আসলে এক বয়স্ক শিশু। একটু না গুছিয়ে দিয়ে চলে গেলে বড় ঋণ থেকে যাবে। দুই ছেলে নিজের নিজের ব্যবসায় ব্যস্ত। রজনীকান্তের কিছু একটা হয়ে গেলে আমিনের ভেসে যাওয়া অনিবার্য। লালপুল পেরিয়ে বামদিকে বাগজান গ্রামে একটা নাবাল জমি আছে রজনীকান্তের। এই বাড়ি থেকে সাইকেলে বড়জোর দশ মিনিটের রাস্তা। শোলা আর মানকচুর জঙ্গলে ভর্তি। এক সকালে ওই দেড় বিঘা জমি এককালের মুনিষ, অধুনা কংগ্রেসি, আধা-নেতা আমিনউদ্দিন আনসারির নামে লিখে দিলেন তিনি। জীবনের উপান্তে এসে আজ একটা প্রশান্তির অনুভূতিতে মন ভরে যায় বৃদ্ধ রজনীকান্তের।

আমিনের এ এক নতুন খেলা। বিকেলে বাজার কমিটির অফিসে যাওয়ার আগে ট্রাক্টর ভর্তি বালি মাটি তিস্তার চর থেকে নিয়ে এসে জমি ভরাট করা। জলা জমির কী খাঁই রে বাপ! ট্রাক্টরের পর ট্রাক্টর মাটি গিলেই চলেছে। নেহাত মাটি কিনতে পয়সা লাগে না এখনও, নেহাত রজনীকান্তের মাগনার ট্রাক্টর, নইলে জমির এই হাঁ মুখ বন্ধ করা আমিনের চৌদ্দপুরুষের ক্ষমতায় কুলোত না। বাজার কমিটির উঞ্ছবৃত্তিতে যা কিছু জমে, রোশনারার কাছেই রাখে আমিন। টাকা বড় বেহুদা জিনিস। হাতে থাকলেই মন উড়তে থাকে, মাথা ভারি হয়ে আসে আমিনের। বাঁশিতে সুর লাগে না। বরং বিবির হাতে টাকা দেওয়ার পর ওর শ্যামলা মুখটিতে কত আলো খেলা করে। দেখে মন ভরে যায়। মন আরও ভরে যায় জমি সমান হয়ে ওঠার পর। এরপর ঘর ছাইতে শুরু করে আমিন। টিনের দেওয়াল, খড়ের ছাউনি। আমিন আর তিনজন কামলা মিলে একদিন ঠিক দাঁড় করিয়ে ফেলে নিজের বাড়ি। মকবুল নামের ছোকরাটি একাই একশো। শরীরে কিলবিল করছে পেশি। দুপুরের পর থেকে মকবুলই ঘর তৈরির ব্যাপারটা দেখতে থাকে। কাজের ছেলে। মাটি দুরমুশ করা বল, পাকা বাঁশ সাইজমতো কাটা বল, টিনের ওপরে স্ক্রু লাগানো বল— মকবুল থাকাতেই তো এই ঘর এত তাড়াতাড়ি উঠে গেল। একদিন চিঠিও আসবে এই ঠিকানায়। নিজের মনেই হেসে ওঠে আমিন। প্রাপক ঃ জনাব আমিনউদ্দিন আনসারি, ভিলেজ ঃ বাগজান, পো ঃ দোমোহানি, জিলা ঃ জলপাইগুড়ি।

সুর খুব খেয়ালি জিনিস। একবার যার সঙ্গে লেগে যায়, লেগেই থাকে। ছাড়ানকাটান নাই। আজ মোক্ষম একটা চাঁদ উঠেছে বাগজানের আকাশে। শ্যামসুন্দর ছেলেটা বাকিদের মতো নয়। মোটরবাইকে মন নাই, উঠতি মেয়েছেলেতে মন নাই... শুধু আমিন বুড়ার আশেপাশে সারাদিন। সুরের ওঠানামা, দোতারার মিষ্টি আওয়াজ আর মিয়াঁ বাঁশিতে সুর তুললেই দাওয়ায় এসে পোষা নেড়ির মত চুপ করে বসে থাকা। তিরিশ পার করেও ছোকরা বিয়ে করল না। দোমোহানি জুনিয়ার হাই-এর প্যারাটিচার। সকালে ইসকুলে বাকি সময়টা আমিনের আশেপাশে ঘুরঘুর। ব্যাটার কষ্ট আছে জীবনে। কষ্ট তো, নিজের দোষে, সেও কিছু কম পায় নি। খোলতাই একটা ঘর তুলেছিল বটে আমিন মিয়াঁ। গৃহপ্রবেশের দিন কুকড়া-ভাত। রজনীকান্তের আশীর্বাদে গোটা গ্রাম এসেছিল দুপুরের ভোজে। ময়নাগুড়ি থেকে অ্যামবাসাডার চেপে কংগ্রেসের নেতারাও। জব্বর বাড়ি হয়েছে বটে তোমার, আমিন। শুনতে শুনতে বুক ভরে গিয়েছিল আমিনের। তা বাড়িটাও তিলে তিলে ভালই জমিয়ে দিয়েছিল মিয়াঁ। চারপাশে সুপুরির গাছ, হাড়ভাঙা গাছের বেড়া। ছাগল, গরুর আলাদা ঠাঁই। উঠোনে খেলতে থাকা মুরগির ঝাঁক। বাগানে ফলন্ত সবজি, লাফা শাকের গাঢ় সবুজ পাতা। মাচা বেয়ে লকলকে পুঁই।

এরমধ্যে সাতাত্তর সনে গোহারান হারল কংগ্রেস। বাজার কমিটির দখল নিলো কাবলু বোসের লোকজন। রজনীকান্ত গত হলে তার দুই ছেলে দুই নতুন দালান করে চলে গেল ময়নাগুড়িতে। মাথার ওপর থেকে ছাতা সরে যাওয়ায় রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা কমে আসে আমিনের। আসলে কোনওকালেই তেমন উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না, কেবল রাজনীতি রাজনীতি খেলায় মেতে ছিল। নতুন বাড়ি এখন আর টানে না রোশেনারাকে। সব সময় মুখ গম্ভীর থাকে ওর। এমন বিচ্ছিরি একটা সময়ে গর্ভবতী হল আমিন মিয়াঁর বউ। চার-পাঁচ মাস পরেই এই সংবাদ বেশ মুখরোচক হয়ে ওঠে গাঁ-গঞ্জে। বাজার কমিটির এক্স-সভাপতি, এক সময়ের কংগ্রেস পার্টির আধা নেতা আমিনের বউ বিয়ের বেশ কয়েকবছর পরে পেট বাঁধালো কী করে, এই কেচ্ছার গন্ধে ম ম করে পাড়ার মোড়

এক রোদ ওঠা সকালে সূর্যের প্রথম সোনালি আলোয় আমিন মিয়াঁকে সর্ষে ক্ষেতে নিয়ে আসে শ্যামসুন্দর। সবুজ সর্ষে গাছে সবে ফুল আসতে শুরু করেছে। সবুজ আর হলুদের এই মায়াবি স্টেজে আমিনকে জমিনের আলে বসিয়ে বাঁশি বাজাতে বলে। এই নেশা ধরা ফুলের ক্ষেতে, এই প্রথম আলোয় আমিনের ভর ওঠে। নেশাগ্রস্থ আমিন ভূতের মতন ডুবে যায় বাঁশির ভেতরে। নাইকুণ্ডলি থেকে বাতাস তুলে আনে আলাভোলা বুড়োটি। সে এক উথালপাথাল কান্নার সুরে ছেয়ে যায় বাগজানের ডুলুং-ডহর। লালপুল সংলগ্ন শ্মশান। শ্যামসুন্দর এই মুহূর্তটি বন্দি করে ফেলে নিজের মোবাইলে। সাড়ে নয় মিনিটের একটি ভিডিও তোলা হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্টুডিয়োতে। যুবক শ্যামসুন্দর ভিডিয়ো ক্লিপটি ফেসবুকে পোস্ট করে দেয়।

থেকে আর পি এফ ট্রেনিং সেন্টারের পাশে গজিয়ে ওঠা নতুন সেলুন পর্যন্ত। লোকাল কমিটির টমি-দা একদিন ওর ভেসপা স্কুটারে চেপে আমিনের বাড়িতে হাজির,

'আমিন মিয়াঁ, যা শুনি সব ঠিক নাকি?'

'হ, আল্লার দান। তুমিও যা শোনো, আমিও তাই জানি টমি।' কথা খুঁজে পায় না আমিন। মাথা নিচু করে বসে থাকে কাঠের টুলে।

'কিন্তু আমাদের তো সবটা জানা দরকার মিয়াঁ, এলাকার পরিবেশ তো এভাবে খারাপ হতে দেওয়া যায় না। তোমার বউ-এর পেটে বাচ্চা আসে কোন ম্যাজিকে?'

'দোষ তো আমারই, টমি। তোমরাও ক্ষমাঘেন্না করে দাও', আমিন মুখ নীচু করেই কোনওমতে উচ্চারণ করে।

'তুমি আলাভোলা মানুষ, তোমার ওপর আমাদের কোনও অভিযোগ নাই। কিন্তু একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশে খোজা লোকের বউয়ের পেটে কীভাবে বাচ্চা আসে এটা তো আমাদেরই দেখতে হবে, মিয়াঁ। পার্টির একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে।'

'কিছু একটা কর, টমি। না হয় খানিক মূল্য ধরে দিতে পারি পাপস্খালনের জন্য', মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করে আমিন।

'বিষয়টা জোনাল অবধি গড়িয়ে গেছে, মিয়াঁ। এক্সটেন্ডেড জি বি মিটিং-এও এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এ তো একটা মস্ত সাংস্কৃতিক দূষণ। পার্টির জুনিয়ার ছেলেছোকরারা ক্ষেপে আছে এই ঘটনায়। তোমরা মিয়াঁ বিবি সামনের রবিবার পিন্টু পালের দোকানের সামনে যে পার্টি অফিসটা আছে, আসবে সেইখানে। পার্টির সিদ্ধান্ত, জানিয়ে গেলাম।'

নতুন ভেসপা স্কুটার স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে যায় টমি মজুমদার। হাওয়ায় ভাসতে থাকে পেট্রলের মিষ্টি গন্ধ। ভেতরের ঘরে রোশেনারার পেটের ভেতরে খলবল করতে থাকে ছয় মাসের একটি জারজ সন্তান। সেই রাতে অনেকক্ষণ ধরে বাঁশি বাজায় আমিন মিয়াঁ। মিঠে সুর ভাসতে থাকে বাতাসে। পলহোয়েল স্কুলের মাঠে জোনাকির স্রোতে ঢেউ ওঠে বাঁশির মূর্ছনায়। পার্টি অফিসের ওপরে শিশির পড়ে। শিশিরে মিশে থাকে আসন্ন অপমানের হিম ঠান্ডা। ভোরের প্রাক্‌মুহূর্তে ঝরিয়া-কে ডাকে আমিন। ঝরিয়ার রিকশায় রোশেনারা বিবিকে বসিয়ে দোমোহানি মোড়ের বাসস্ট্যান্ডে আসে দুজনে। বাঁ দিকে পোয়াতি বউ, ডাইনে আমিন মিয়াঁ, পায়ের কাছে টিনের সুটকেস। ঠিক যেভাবে এক বিকেলে দুজনে এসেছিল এই গ্রামে। খানিক বাদে প্রথম বাস আসে। মকবুলের হাতে রোশেনারাকে তুলে দেয় আমিন। দোমোহানি-ফালাকাটা রুটের লঝঝড়ে লোকাল বাসে মিলিয়ে যায় আমিন মিয়াঁর ঘর গেরস্থালি।

শ্যামসুন্দর খুব ভাল দোতারা বাজায়। গানের গলাটিও ভারি মিঠে। আজকাল এদিক ওদিক ফাংশানে গানও গাইছে বেশ। বুড়ো আমিনকে বারবার তাগাদা দেয় ছোকরা,

'চাচা, একবার তো বাঁশি নিয়ে স্টেজে ওঠো। দুনিয়া কেঁপে যাবে।'

আমিনের চোখ বরফে থাকা ইলিশ মাছের মত। বাঁশি সে নিজের ইচ্ছায় বাজায়, ভালবেসে। কোনও তাগিদ নেই মঞ্চে ওঠার। ঠেকিয়ে রাখে শ্যামসুন্দরকে,

'ওসব ছাড় বাপ। ফ্যাপরায় আর দমও নাই অত।'

শ্যামসুন্দর বোঝে আমিন চাচাকে স্টেজে তুলে বাঁশি বাজানো অসম্ভব। নইলে বুড়োর ফুসফুসে এখনও কত বাতাস, তা ভালই জানে সে। এক রোদ ওঠা সকালে সূর্যের প্রথম সোনালি আলোয় আমিন মিয়াঁকে সর্ষে ক্ষেতে নিয়ে আসে শ্যামসুন্দর। সবুজ সর্ষে গাছে সবে ফুল আসতে শুরু করেছে। সবুজ আর হলুদের এই মায়াবি স্টেজে আমিনকে জমিনের আলে বসিয়ে বাঁশি বাজাতে বলে। এই নেশা ধরা ফুলের ক্ষেতে, এই প্রথম আলোয় আমিনের ভর ওঠে। নেশাগ্রস্থ আমিন ভূতের মতন ডুবে যায় বাঁশির ভেতরে। নাইকুণ্ডলি থেকে বাতাস তুলে আনে আলাভোলা বুড়োটি। সে এক উথালপাথাল কান্নার সুরে ছেয়ে যায় বাগজানের ডুলুং-ডহর। লালপুল সংলগ্ন শ্মশান। শ্যামসুন্দর এই মুহূর্তটি বন্দি করে ফেলে নিজের মোবাইলে। সাড়ে নয় মিনিটের একটি ভিডিও তোলা হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্টুডিয়োতে। যুবক শ্যামসুন্দর ভিডিয়ো ক্লিপটি ফেসবুকে পোস্ট করে দেয়।

৬।

একতলার ঠিক ওপরে হাইফেনের মত একটা মেজেনাইন ফ্লোর। ইলা ব্যানার্জির বাড়িতে এলেই ভুলভুলাইয়ার কথা মনে আসে মংরার। এ তো বাড়ি নয়, ছোটখাট পাড়া একটা। সম্পর্কে মংরা আর ইলা তুতো ভাইবোন। মংরা ভালই জানে, খলের ছলের অভাব নেই, তার বোনটিরও পার্টি দেওয়ার জন্য ছুতোনাতার অভাব নেই। কয়েকদিন আগেই ইলার পোষ্য 'রেক্স'-এর সঙ্গে রানা মিত্রর 'ডোরা' সারাদিন একসঙ্গে ছিল। সঞ্জয় বাগচির ড্রাইভারের মুখে মুখে একথা সব্বাই জানে রেক্স আর ডোরা প্রথম ডেটেই বেশ সাকসেস্‌ফুলি পারফর্ম করেছে। তবু ইলা, ইলাই। খলের ছলের অভাব হয় না। তাই আজ ডোরাকে নিয়ে আসা হয়েছে মধুপুরে। 'মধুকুঞ্জ' সন্ধে থেকে ভরে উঠেছে লোকজনে। একতলায় অল্পবয়েসি কবিকুলের সঙ্গে কিছু একটা নিয়ে তর্কে মেতে আছে তথাগত। কবিদের বেশিভাগই মেয়ে। পুরুষেরা অলরেডি ছাদে। স্ফটিক পানপাত্রে ছন্দ মিশিয়ে নিচ্ছে যে যার নিজের মত করে। তথাগতর সঙ্গে থাকা মেয়েরাও ছাদের এই খোলা হাওয়ায় ডুবতে রাজি কিন্তু তথাগতর অন্তত দশটা কবিতা শুনতেই হবে। মানে শুনিয়েই ছাড়বে তথাগত। কবিতায় সেকুলার ঘামের গন্ধ, খিদের আঁচে টগবগ করে ফুটতে থাকা ভাতের নৃত্য। মধুপুরের নবারুণ তথাগত অল্পবয়েসি মেয়েদের সামনে যৌনতা, খিদে এবং ভাতের কবিতা বলে। কারণে, অকারণে। মেয়েরাও মনে মনে হাসে। জানে মধুপুর শহরে তথাগতর থেকে 'নিরাপদ' পুরুষ আর একটিও নেই। ছাদে ওঠার আগে দশটি কবিতা মেয়েদের শুনতেই হবে।

মংরা তথাগতকে টপকে মেজেনাইন ফ্লোরে আসে। এই জায়গাটা একটু ফাঁকা। ব্যালকনির একটা চেয়ারে বসে ঝুপ্পুস এক সিলভার ওক্ গাছের দিকে তাকিয়ে মন ভাল হয়ে যায় মংরার। কিন্তু কয়েকমিনিট বাদেই ইলা আবিষ্কার করে মংরাকে,

'তুই কি কখনোই মানুষ হবি না? এত মানুষজনের কেউই কি তোর পছন্দের না?'

মংরার উত্তরের অপেক্ষা না করেই ইলা ওকে ছাদে টেনে নিয়ে যায়। পলাশ আর বাপ্পা এরমধ্যেই বেশ 'হাই'। মংরা গ্লাসে ব্যাকার্ডি নিয়ে এক কোণে আসে। ইলার পার্টিতে 'ওল্ড মঙ্ক'-এর জায়গা নেই। বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর দিন গিয়াছে। বস্তুত, হোয়াইট রাম ছাড়া ইলার ককটেলে অন্য কোনও রাম নেই। তাও মংরার জন্যই। মংরা রামভক্ত। এইসব পার্টিতে ও অড ম্যান আউট। কবিরা নিজেরাই নিজেদের গ্রুপ নিয়ে ব্যস্ত। উকিলরা কেসের ব্রিফ্ নিয়ে। আর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথিরা এখানে বেশ বিব্রত কারণ ইলার বাড়ির অনুষ্ঠানে অন্তত দশজন প্রতিষ্ঠিত চিফ গেস্টের নেমন্তন্ন বাঁধা। দুপাত্র পেটে পড়লেই এই মফস্সল শহরের বাঁধা প্রধান অতিথিরা নিজেদের মধ্যে বাক্‌যুদ্ধে মেতে ওঠে।

আজ বোধহয় নতুন কিছু একটা হবে। ইলা ছাদের এককোণে সাদা স্ক্রিন টাঙিয়েছে একটা। সামনে প্রজেক্টর মেশিন। এটা আইটেম হিসেবে নতুন। ইলার এইসব পার্টি মূলত বন্ধুবান্ধবদের গেটটুগেদার। পার্টির বাহানায় ইলার খরচ করার ছল। মংরা ভেবে পায় না, আজকের পার্টিতে হঠাৎ এই স্ক্রিনই বা কেন, কেনই বা জেলার ডি এম! এছাড়াও সমরদা এসেছেন শিলিগুড়ি থেকে। সমরদা গুণী মানুষ, দিলদার হৃদয়। প্রশংসা করতে পারেন। সাদাকে সাদা বলতে পারেন, কালোকে কালো। আজকের পার্টিতে, সব পার্টির মতই, কিছু দুঃখী মানুষও এসেছেন। এঁদের বিখ্যাত হওয়ার কথা ছিল কিন্তু গোটা পৃথিবীর ষড়যন্ত্রে এঁরা সাইডলাইনের ধারে। এঁদের কবিতা, গান এবং গল্প আর্টের শেষকথা। শুধু 'লাইন' আর যোগাযোগের অভাবে

আজ বোধহয় নতুন কিছু একটা হবে। ইলা ছাদের এককোণে সাদা স্ক্রিন টাঙিয়েছে একটা। সামনে প্রজেক্টর মেশিন। এটা আইটেম হিসেবে নতুন। ইলার এইসব পার্টি মূলত বন্ধুবান্ধবদের গেটটুগেদার। পার্টির বাহানায় ইলার খরচ করার ছল। মংরা ভেবে পায় না, আজকের পার্টিতে হঠাৎ এই স্ক্রিনই বা কেন, কেনই বা জেলার ডি এম! এছাড়াও সমরদা এসেছেন শিলিগুড়ি থেকে। সমরদা গুণী মানুষ, দিলদার হৃদয়। প্রশংসা করতে পারেন। সাদাকে সাদা বলতে পারেন, কালোকে কালো। আজকের পার্টিতে, সব পার্টির মতই, কিছু দুঃখী মানুষও এসেছেন। এঁদের বিখ্যাত হওয়ার কথা ছিল কিন্তু গোটা পৃথিবীর ষড়যন্ত্রে এঁরা সাইডলাইনের ধারে। এঁদের কবিতা, গান এবং গল্প আর্টের শেষকথা।

সেসবের সঠিক মূল্যায়ন হল না।

মংরা ব্যাকার্ডির গ্লাস হাতে নিয়ে একটা কোণে বসে। নতুন ডি এম রসিক মানুষ। এরমধ্যেই জমিয়ে ফেলেছেন। বয়স পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন। বেশ ফর্সা। পরনে নীল জিন্স, সাদা টি-শার্ট। শরতের আকাশ যেন ভদ্রলোকের ইউনিফর্ম। নীলসাদা ডি এম সাহেবের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে মধুপুরের মধ্যচল্লিশ দুপুরবিলাসী মহিলারা প্রায় সকলেই জুড়ে গিয়েছে। সাহেব নিজেও বেশ এনজয় করেন এই ফ্যান ফলোয়িং। প্রোমোটি এই ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আগেও এই জেলায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কাজ করে গিয়েছেন। তখন পুলের জিপে অফিস যেতেন, কালেক্টরেটের একটা ছোট্ট ঘরে বসতেন। রেভিনিউ মুন্সিখানার দায়িত্বে ছিলেন। তখন উনি মাথায় জবাকুসুম তেল মাখতেন। মুখে বোরোলীন। মফতলালের কাপড় কিনে দেবেশ দর্জির থেকে প্যান্ট বানিয়ে নিতেন। কবিতা এবং গল্পের ধারেকাছেও কোনওদিন দেখা যায়নি ওঁকে। মেয়েদের দেখলেও বেশ এড়িয়ে চলতেন। সেই ভদ্রলোক প্রায় তিরিশ বছর বাদে এই জেলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ফ্ল্যাশার লাগানো গাড়ি, সামনে পেছনে সিকিউরিটি। তিরিশ বছর আগে ডেপুটি সাহেবের স্ত্রী অধস্তন কর্মীদের কাছে 'বউদি' ছিলেন এখন ডি এম সাহেব নিজেই নিজের স্ত্রীকে 'ম্যাডাম' বলেন। শোনা যায় ডি এম বাংলোয় নাকি দুটো গরু আর একটা কুকুরও পোষা হয় এখন। 'ম্যাডাম' বাইরের দুধ খান না। ডেপুটি সাহেব আগে নৌশাদের সেলুনে লাইন দিয়ে নিজের ঘন কালো চুল কাটাতেন এখন প্রতি রবিবার বৃদ্ধ নৌশাদ নিজেই ডি এম বাংলোয় যায় সাহেবের চুল কাটতে। নৌশাদ বুড়ো হয়ে গেলে কী হবে, প্রস্টেটের সামান্য সমস্যা থাকলেও ডি এম সাহেবের বয়স কমেছে। চুলও। ডি এম বাংলোয় মাসে দুটো সাহিত্যবাসর বসে। 'ম্যাডাম' শ্রীমতী আরতিরানী গুহও কবিতা লেখেন নিয়মিত। এবং প্রচুর।

অনেকক্ষণ আগেই মংরা দেখেছে ছাদের একদিকে ইলা ব্যানার্জি, ডি এম সাহেব এবং আরও কয়েকজন এক দোহারা চেহারার যুবককে নিয়ে ব্যস্ত। ছেলেটির বয়স ত্রিশের আশেপাশে। সাদা পায়জামা, সাদা পাঞ্জাবি। মুখে একটা সরল গ্রাম্য হাসি। ছেলেটির নাম শ্যামসুন্দর। ভাল গান গায়, খুব ভাল দোতারাও বাজায়। 'রেক্স' আর 'ডোরা'র 'ডেট' বাদ দিলে আজকের পার্টির মুখ্য আকর্ষণ এই ছেলেটি। প্রোমোটি ডি এম নাকি নিজে এই ছেলেটিকে প্রোমোট করতে চান। আটটা নাগাদ তথাগত, কবিদের বাহিনী এবং বাকি নিমন্ত্রিত মানুষজন একজায়গায় আসে। সামনের সোফায় শ্রীমতি আরতিরানী এবং ডি এম সাহেব। আরতিরানীর দুটো দীর্ঘ কবিতাপাঠের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছে এই অনুষ্ঠান। প্রথম কবিতার নাম 'হাইভোল্টেজ পরকীয়া', দ্বিতীয়টি 'ঝুলবারান্দার অন্তর্বাস'। এরমধ্যে মংরা ব্যাকার্ডির গ্লাস রিফিল করে নিয়ে আবার নিজের জায়গায় আসে। শ্যামসুন্দর হাতজোড় করে সবাইকে নমস্কার করার পর দোতারা বাজিয়ে গান শুরু করে। বড় মিঠে গলা ছেলেটির। সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে প্রায় চল্লিশ মিনিট টানা গাওয়ার পর আবার সবার উদ্দেশে হাতজোড় করে। হাততালি থেমে এলে শ্যামসুন্দর খুব বিনীত ভাবে একটা আর্জি জানায়,

'আমার মত এক সাধারণ গাইয়ের গান এতক্ষণ ধরে শুনলেন আপনারা। আমার আভূমি কৃতজ্ঞতা সকলের কাছে। আমার আর একটি ছোট্ট অনুরোধ রয়েছে, ইলাদিকেও বলেছি। আমার চাচা জনাব আমিনউদ্দিন আনসারি খুব ভাল বাঁশি বাজান। ওঁর বাঁশি বাজানোর একটি সাড়ে নয় মিনিটের ভিডিয়ো আমি তুলেছিলাম। ফেসবুকে পোস্টও করি। এর মধ্যেই কয়েক হাজার শেয়ার হয়েছে সেই ভিডিয়ো। সমবেত বুধমণ্ডলী, যদি আপনারা অনুগ্রহ করে একটু শোনেন।'

দেখা গেল উপস্থিত অনেকেই এই ভাইরাল ভিডিয়োর কথা জানে।

এরপরে মধুকুঞ্জের ছাদে প্রজেক্টর মেশিন থেকে ওই সাদা স্ক্রিনে ভেসে ওঠে আমিন মিয়াঁর মুখ। সর্ষে ক্ষেতে বসে থাকা এক বৃদ্ধ বাঁশি বাজাচ্ছেন। এই মুহূর্তে আমিন মিয়াঁর বাঁশির সুর জ্যোৎস্নার মত ধুয়ে দিচ্ছে মধুকুঞ্জের ছাদ। অভ্যাগতরা সকলেই মুগ্ধ এবং বিস্মিত। বাড়ির পাশেই বাগজান গ্রামে এমন একটি প্রতিভা অথচ তাঁরা এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র ওয়াকিবহাল নন... এই আলোচনাই ঘুরপাক খেতে থাকে।

বাড়ি ফিরে অনেক রাতে একটা মেসেজ পায় মংরা। শ্যামসুন্দরকে আরও বড় স্কেলে প্রোজেক্ট করতে হবে। ছেলেটি ফ্রেশ এবং কোথাও কোনও ছাপ নেই। প্রয়োজনে আমিন মিয়াঁকেও জুড়ে নিতে হবে এই ভেঞ্চারে। আমিনের বাঁশিতে জাদু আছে আর শ্যামসুন্দরের গানে মাটির কথা। কিন্তু লিরিক আরও পেনিট্রেটিভ হতে হবে। 'ট্রিপল আর' চাইছেন মাটির এই মানুষগুলোর জন্য মাটির গন্ধমাখা কথা ও সুর। সঙ্গে আমাদের বার্তা। মেসেজটা পাঠিয়েছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ইতিহাসের অধ্যাপক। 'কোড গ্রিন'-এর সাংস্কৃতিক দিকটা দেখেন। খুব মৃদুভাষী, স্থিতধী এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক। সাংস্কৃতিক ব্যাপার স্যাপারে মংরার বিশেষ উৎসাহ কোনওকালেই নেই। ও বোঝে, অধ্যাপকমশাই ইলার সঙ্গে ওর আত্মীয়তাটাকেই কাজে লাগাতে চাইছেন। এই প্রথম 'কোড গ্রিন'-এর কোনও অপারেশনে মংরা অসহায় ফিল করে। এই কবি, অধ্যাপক, সাহিত্যিক, গাইয়ে এবং বাজিয়েদের ডিল করা একটা জটিল এবং ভজঘট এপিসোড। তাছাড়া ইলাকে কীভাবে কথাটা পাড়বে, এটাও ভাবতে শুরু করে মংরা। খুব ভাল হয় 'ম্যাডাম' আরতিরানীকে জড়িয়ে নিতে পারলে। ডি এম-এর চেয়ে ম্যাডাম ডি এমকে অনেক অ্যাগ্রেসিভ বলে মনে হয়েছে মংরার। তথাগত এবং অপাপবিদ্ধা সিংহ রায়কে ফোল্ডে নিয়ে এলেই কাজটা হয়ে যাবে বলে মনে হয়। একটু 'প্রান্তিক' ব্যাপার জুড়ে দিলে তথাগত একাই ফেসবুকে দিনরাত শেয়ার করে যাবে আমিন মিয়াঁর বাঁশির ভিডিয়ো আর অপাপবিদ্ধা সিংহ রায়ের জন্য সরকারি গ্ল্যামারের ছিটেফোঁটা। সাংবাদিকদের 'বাইট' দেবেন 'ম্যাডাম' আরতিরানী। এই ছকে এগোলে স্মুথলি নেমে যাওয়া উচিত। লিরিক-এর দিকটা দেখার জন্য অধ্যাপক কোচবিহারের এক অল্পবয়সি কবিকে ভেবেছেন। পীযূষ অধিকারীর সুরের ওপর ভাল দখল, শব্দের ওপরেও। 'কোড গ্রিন'-এর ডাই হার্ড ফলোয়ার।

আগেই খবর চলে গিয়েছিল। ময়নাগুড়ির বিডিও, লোকাল থানার ওসি এবং পঞ্চায়েতের লোকজন সকাল থেকেই বাগজান গ্রামে। আমিন মিয়াঁর দেড়বিঘা জমির আশেপাশে সরকারি গাড়ির ভিড়। ডি এম এবং অন্যান্য অভ্যাগতদের বসবার জন্য মুকুল সাহার বাড়ি থেকে সোফা সেট নিয়ে আসা হয়েছে। লোকাল টিভি চ্যানেলের লোকজন তো এসেছেই, দু-একটা কলকাতার চ্যানেলের সাংবাদিকও বুম নিয়ে হাজির। উত্তরবঙ্গ বার্তার মধুপুর করেস্পন্ডেন্ট সাদা পাঞ্জাবীর ওপর খয়েরি জহর কোট গায়ে ছোটাছুটি করছে।

বেলা বারোটা নাগাদ বড়সড় একটা গাড়ির কনভয় আমিনের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। ডি এম সাহেব, আরতিরানী, ইলা ব্যানার্জি, তথাগত, পীযূষ এবং অপাপবিদ্ধা সকলেই এক এক করে নেমে আসে। আমিন এবং শ্যামসুন্দরের সঙ্গে কথা হয় সকলের। বুড়ো আমিন মিয়াঁ মোটামুটি বিহ্বল। তার বাঁশির আওয়াজ শুনে জিলা কালেকটর সস্ত্রীক ছুটে আসবে এই নাবাল জমির বাড়িতে, এও কি সম্ভব! মোবাইল কী জিনিষ রে বাপ! একটা ভিডিয়োর এত ক্ষমতা। ঠিক হয় 'বাতাস বাংলা' টিভির 'উত্তরের মুখ' অনুষ্ঠানে আমিন মিয়াঁ এবং শ্যামসুন্দর-এর প্রোগ্রাম টেলিকাস্ট হবে ঠিক একমাস বাদে। লোকাল টিভি চ্যানেলে 'ম্যাডাম' আরতিরানী এবং ডি এম সাহেব দুজনেই জানালেন, 'সমাজের এই অনালোকিত মানুষজনকে যথাযথ স্বীকৃতির আলোয় নিয়ে আসাটাও প্রশাসনের দায়িত্ব। তাছাড়া গ্রামবাংলার মাটির কাছাকাছি জুড়ে আছে যে সংস্কৃতি, তার প্রসার ও প্রচার খুব জরুরি। কয়েকদিনের মধ্যেই আর্ট গ্যালারিতে জিলা তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এই দুই শিল্পীর অনুষ্ঠান হবে একটা। ডি এম সাহেবের পক্ষ থেকে অপাপবিদ্ধা সিংহ রায়কে গোটা অনুষ্ঠানের রিসোর্স পার্সন হিসেবে ঘোষণা করে দেওয়া হল বাগজানের মাটি থেকেই। তথাগত কো-অর্ডিনেটর।

মঙ্গলে ঊষা বুধে পা, যথা ইচ্ছা তথা যা। একমাস বাদে, কোনও এক বুধের সকালে পীযূষ, শ্যামসুন্দর এবং আমিন মিয়াঁ ট্রেনে ওঠে। ডাউন হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট। মিয়াঁর এই প্রথম এসি কামরায় ভ্রমণ। স্টেশনে প্রায় গোটা মধুপুর সী অফ্ করতে এল এই দুই শিল্পীকে। 'ম্যাডাম' আরতিরানী ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানালেন দুজনকেই। নিজেই দুটো মানপত্র লিখে এনেছেন স্বরচিত কবিতায়। তথাগত পাঠ করে শোনালো সেই মানপত্র। আজকের 'উত্তরবঙ্গ বার্তা'র বিশেষ ক্রোড়পত্রে অপাপবিদ্ধা সিংহ রায় 'বাগজানের বাঁশিওয়ালা' শীর্ষক একটা উত্তর সম্পাদকীয় লিখেছে। ফেসবুকে পোস্ট করার করার পর একশো আশিটা লাইক পড়েছে এখনও পর্যন্ত। তথাগত-দা লাইক করেনি ওই পোস্টে। এইসব হিংসের জবাব একদিন ঠিক দিয়ে দেবে অপাপবিদ্ধা। পরের ওয়ার্কশপে রোহন-দাকে বলে নাম কাটিয়ে দিতে হবে তথাগতর।

একটু বাদে ট্রেন রানিনগর স্টেশনে আসে। এক মিনিটের স্টপেজ। পীযূষ ফোন করে মংরাকে। মংরা রানিনগর থেকে উঠেছে এই ট্রেনে। জেনারেল কামরায়।

ডাউন হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট নিজের মত চলতে থাকে কলকাতার দিকে। সুরের সাম্পান ভেসে যায় উত্তর থেকে দক্ষিণে।

রচিত হয় ষড়যন্ত্রের বাসরঘর।

(চলবে)

তাজ্জব মহাভারত

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

ভুসুকুকে অপহরণ করে পুন্ডরীকাক্ষ চলছিলেন যমারণ্যের পথে। সেখানে অসভ্য জাতিকে রাতারাতি জয় করে নিয়েছেন মহিষাসুর। যমারণ্যের পথ এখন মুক্ত। ছদ্মবেশে দেশভ্রমণের পরিকল্পনার অজুহাতে পান্ডবরা একত্রে বের হলেন ভুসুকুকে উদ্ধারের জন্য। সঙ্গে থাকলেন কামরূপপ রাজের রাজদূত মহাবলী। কিন্তু দুর্যোধন এবং কর্ণ অনুমান করতে পারলেন যে কোথাও ভুসুকুর সঙ্গে যুধিষ্ঠির বা পান্ডবদের যোগ থাকা সম্ভব। ভুসুকুকে সম্মোহন করা হবে। তার জন্য স্থানও নির্বাচিত। কিন্তু বিপদহীন যমারণ্যের অপূর্ব পরিবেশে সিদ্ধান্ত বদলালেন অম্লরাজ অঙ্গার? ভুসুকু সম্মোহিত হয়ে কী করবে? **ভুসুকুকে অপহরণ করে পুন্ডরীকাক্ষ চলছিলেন যমারণ্যের পথে। সেখানে অসভ্য জাতিকে রাতারাতি জয় করে নিয়েছেন মহিষাসুর। যমারণ্যের পথ এখন মুক্ত। ছদ্মবেশে দেশভ্রমণের পরিকল্পনার অজুহাতে পান্ডবরা একত্রে বের হলেন ভুসুকুকে উদ্ধারের জন্য। সঙ্গে থাকলেন কামরূপপ রাজের রাজদূত মহাবলী। কিন্তু দুর্যোধন এবং কর্ণ অনুমান করতে পারলেন যে কোথাও ভুসুকুর সঙ্গে যুধিষ্ঠির বা পান্ডবদের যোগ থাকা সম্ভব। ভুসুকুকে সম্মোহন করা হবে। তার জন্য স্থানও নির্বাচিত। কিন্তু বিপদহীন যমারণ্যের অপূর্ব পরিবেশে সিদ্ধান্ত বদলালেন অম্লরাজ অঙ্গার? ভুসুকু সম্মোহিত হয়ে কী করবে?**

৩০

যমারণ্যের পরিবেশ বিস্ময়কর। অসভ্য জাতির আক্রমণের ভয়ে অরণ্যপথ দিয়ে বহুকাল লোক যাতায়াত প্রায় ছিল না। সুদূর অতীতে হস্তিনাপুরের এক রাজা যমারণ্যের মধ্যে দিয়ে পথিকদের যাতায়াতের সুবিধের জন্য কয়েক ক্রোশ অন্তর চমৎকার পান্থশালা বানিয়ে দিয়েছিলেন। প্রশস্ত পথ বানিয়ে দিয়েছিলেন অরণ্যের ভেতর। গাছ কেটে সরোবর স্থাপন করিয়েছিলেন। অসভ্য জাতিরা অবশ্য সে সব যত্নেই রেখেছিল। মহিষাসুর তাঁদের অর্থনীতি বিষয়টা ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়ার পর তাঁরা রাতারাতি পান্থশালাগুলি ঝেড়েপুঁছে ঝকঝকে করে ফেলেছে। দক্ষিণা কত হবে তা অবশ্য স্থির হয় নি।

পুন্ডরীকাক্ষের বাহিনী ভুসুকুকে নিয়ে ফুরফুরে মনে যমারণ্যপথে এগিয়ে যাচ্ছিল। এমন অরণ্য ভুসুকু কখনো দেখে নি। বিশাল বৃক্ষের গায়ে জড়িয়ে আছে নানা রঙের লতা। হাওয়া দুলছে হরেক রকম ফুল। বনের বাতাস ম ম করছে পুষ্পগন্ধে। এদিক ওদিকে মাঝে মাঝেই চোখে পড়ছে বিচিত্র সব জন্তুর অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকা কিংবা ছুটে পালিয়ে যাওয়া।

'সব কিছু আমাদের অনুকূলে।' পুন্ডরীকাক্ষকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন অম্লরাজ অঙ্গার। 'যমারণ্যের পরিবেশ এমন শান্তিপূর্ণ হয়ে যাবে তা আমার চিন্তাতীত ছিল। একেই বলে মেঘ না চাইতেই জল।'

'যমারণ্যের পথ যে বিপদমুক্ত হয়েছে তা প্রচারিত হতে আরো কিছুদিন লাগবে। আমরা নির্বিঘ্নে যমারণ্য অতিক্রম করে যাব।'

'অতিক্রম কেন?' অম্লরাজের মুখে মৃদু মৃদু হাসি ফুটল। 'ওদিকে তাকাও। একটি মনোরম পান্থশালা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।'

পুন্ডরীকাক্ষ তাকালেন। গাছপালার ফাঁক দিয়ে উদ্যানশোভিত প্রাঙ্গণ চোখে পড়ছিল। ভাল করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় সে উদ্যানে একাধিক কুটির রয়েছে।

'ওদিকে চলো। সম্মোহনের জন্য এর চাইতে ভাল পরিবেশ আর হয় না।'

এবার অম্লরাজের উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন পুন্ডরীকাক্ষ ধূর্জটিবর্মা। সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিলেন বাহিনীর অভিমুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য। প্রায় আধা ক্রোশ পথ হাঁটার পর দেখা গেল একটি অপূর্ব উদ্যান। সেখানে অনেকগুলি কুটির। বাহিনী আরেকটু এগোতেই আচমকা গাছপালার আড়াল থেকে কয়েকজন অরণ্যবাসী হাসিমুখে বেরিয়ে এসে ভাঙা ভাঙা হস্তিনাপুরি ভাষায় অভ্যর্থনা জানাল। পুন্ডরীকাক্ষ ওদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'আমরা এই উদ্যানে থাকতে চাই।'

'একশ বার থাকবেন। তবে দক্ষিণা এখনো ধার্য হয় নি। এ নিয়ে আলোচনা চলছে।'

'তা হলে উপায়?'

'আমাদের অনুমান এই ধরনের উদ্যানশোভিত কুটিরের দক্ষিণা দিনে দুই মোহরের বেশি হবে না।'

'বলো কী?' পুন্ডরীকাক্ষ বিস্মিত হলেন। 'এ তো জলের দর!'

'আপনারা ক-দিন থাকবেন?'

'দিন দুয়েক তো বটেই।'

'তবে মোট চোদ্দ মোহর।'

'চোদ্দ?'

'আড়াই শো শতাংশ কর ধরতে হবে। মহিষাসুর বলেছেন পর্যটকদের ওপর কর ধার্য করতে।'

'বটে বটে!' মনে মনে মহিষাসুরে মুন্ডুপাত করতে করতে চোদ্দ মোহর বের করে দিলেন পুন্ডরীকাক্ষ। ওরা মোহর গুণে নিয়ে হাসিমুখে আবার অরণ্যের গাছপালার ফাঁকে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। পুন্ডরীকাক্ষ সবাইকে জানিয়ে দিলেন আগামি দু-দিন এখানে অবসর নেবেন। বাহিনীর সবাই খুশি মনে উদ্যানে প্রবেশ করে নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত

হয়ে পড়ল।

উদ্যানটি বিরাট। সরোবর টলটলে। কুটিরগুলি বেশ শক্তপোক্ত। ভাঁড়ার ঘরে প্রচুর খাদ্য আর শুকনো জ্বালানি কাঠ পাওয়া গেল। অন্নরাজ চারদিক একবার ঘুরে নিয়ে উদ্যানের দক্ষিণ কোণে চারটি কুটির বেছে নিলেন। ভুসুকুকে বলা হল সেই চারটির একটিতে আশ্রয় নিতে। অনুমতি ছাড়া কেউ যে এদিকে আসতে পারবে না— তা জানিয়ে দেওয়া হল। ভুসুকু দেখল বাকি তিনটি কুটিরের দুটি গ্রহণ করলেন অন্নরাজ আর পুন্ডরীকাক্ষ। চতুর্থ কুটিরে রাখা হল নানা রকম থলে, পাত্র সমেত অজানা নানা জিনিস।

ভুসুকু নিজের কুটিরে ঢুকে দেখল সুন্দর দুগ্ধফেননিভ শয্যা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। শিবিরের শয্যায় তাঁর ভাল ঘুম হচ্ছিল না। যা পরিস্থিতি তাতে চুপচাপ মাথা ঠান্ডা রেখে সব কিছু দেখা ছাড়া তাঁর কোনও উপায়ও নেই। কাজেই সে লোভনীয় শয্যা পেয়ে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল।

'আমি আজ রাতের মধ্যে সম্মোহনের আয়োজন সম্পূর্ণ করে ফেলব।' ভুসুকু কুটিরে ঢুকে গেছে দেখে মৃদু স্বরে বলতে শুরু করলেন অন্নরাজ অঙ্গার। পুন্ডরীকাক্ষ ফিসফিস করে জিগ্যেস করল, 'সম্মোহন কখন হবে?'

'কাল সূর্যোদয়ের ঠিক আগে। তারপর ছেলেটাকে পাঠিয়ে দেবে হস্তিনাপুরের দিকে। দুটো ঘোড়া দেবে সঙ্গে। একটায় থাকবে রাত কাটাবার উপযোগী ছোট শিবির। গরম কাপড়। খাদ্য। এর ফলে ও নিরাপদে হস্তিনাপুর পৌঁছে যাবে।'

'তারপর?'

'অপহরণের পর থেকে যা ঘটবে তা ওর মনে থাকবে না। ওর কেবল একটাই লক্ষ্য হবে— দুর্যোধনের উন্নতি। আমি নিশ্চিত যে সে আর অদন্ত মিলে ভূতমিত্রের আশ্রমের ছাত্রদের সবাইকে দুর্যোধনের দিকে নিয়ে আসবে। আশ্রম থেকে একবার দুর্যোধনের যুবরাজত্বের দাবি উঠলে তা নাগরিকরা উড়িয়ে দিতে পারবে না। অস্থিরতা তৈরি হবে। আমাদের কাম্যই তো তাই।'

'আর আমরা?'

'আবার ধীরে সুস্থে হস্তিনাপুর ফিরে যাব।'

অন্নরাজ কথাটা বলে টান টান হয়ে বসে চোখ বুঁজলেন। তাঁকে ধ্যানস্থ হতে দেখে পুন্ডরীকাক্ষ আর কথা না বাড়িয়ে নেমে পড়লেন কাজে। গুরুদেব কীভাবে সম্মোহনের কাজটা করে তা তিনি আগে চাক্ষুস করেন নি। তবে শুনেছেন। এই কাজের জন্য সবার আগে দরকার হবে একটা উনুন। পুন্ডরীকাক্ষ সেটা সহজেই কিছুক্ষণের মধ্যে খুঁড়ে ফেললেন। অন্নরাজ সেটা দেখে প্রসন্ন মনে আদেশ দিলেন অগ্নিসংযোগের। অন্নরাজের পদবী অঙ্গার কারণ অঙ্গারবিদ্যায় তাঁর অভূতপূর্ব জ্ঞান। অঙ্গারের গুণাগুণ বুঝে কতটা কী পরিমাণে উনুনে দিতে হবে— সেই গণনা নির্ভুলভাবে কষে উপযুক্ত তাপের আঁচ প্রস্তুত করায় তিনি প্রায় অদ্বিতীয়।

উনুন কাঠকয়লায় জ্বলল। অন্নরাজ তার মধ্যে বিশেষ চূর্ণ পদার্থ অল্প অল্প করে ঢালতে লাগলেন। একটু পরেই উনুনে হালকা আঁচের আগুন তৈরি হল। তার রঙ নীল। ধোঁয়ার পরিমাণ খুব কম। একটু রুপোর পাত্রে হালকা সোনালি বর্ণের তরল এনে বসান হল সেই আঁচে। তরলটা মধ্যরাত পর্যন্ত ফুটবে এই আগুনে। সময় মত তাতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য মিশিয়ে দেবেন অন্নরাজ। মধ্যরাতের পর এক সময় দেখা যাবে তরলের বর্ণ বদলে যাচ্ছে উজ্জ্বল সোনালিতে। ভোরের আগে সেটা পরিণত হবে গলিত স্বর্ণের মত দেখতে একটি পদার্থে। তখন তার মধ্যে জল ঢেলে ঠান্ডা করা হবে। স্বর্ণবৎ দ্রব্যটি কিন্তু জলে বিন্দুমাত্র মিশবে না।

এই সোনালী অতি ঘন তরলটির নাম মনোহরণী ননি। এই ননি কোনও ব্যক্তির কপালে শীতল-শান্ত পরিবেশে মাখিয়ে দেওয়ার পর বিশেষ কৌশল অবলম্বন করলেই ব্যক্তিটি সম্মোহিত হয়ে যাবেন। ভুসুকে সে ভাবেই করা হবে সম্মোহন।

তবে কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। অন্নরাজ বিচার করে দেখেছেন যে ভুসুকুর জীবন যাপন সম্মোহনের আদর্শ। বস্তুতঃ হস্তিনাপুরিরা সবাই সম্মোহিত হওয়ার আদর্শ জীবন যাপন করেন। ভুসুকুও এখন সেই জীবনই যাপন করে আসছে। নইলে অসুরদের জীবন যাপনে এমন কিছু ব্যাপার আছে যার ফলে তাঁদের সম্মোহন করা কঠিন।

পরদিন সূর্যাস্তের ঠিক আগে ভুসুকুর কপালে মনোহরণী ননি মাখিয়ে দিয়ে অন্নরাজ বললেন, 'আমার চোখের দিকে তাকাও!'

ভুসুকুর মনে হলে মাথাটা হাল্কা হাল্কা লাগছে। সে অন্নরাজের চোখের দিকে তাকাল। লোকটার দু-চোখ জ্বলজ্বল করছে। ভুসুকু চোখ সরাতে পারল না।

'আশ্রম থেকে কীভাবে এখানে এলে তা মনে আছে?'

অন্নরাজ জিগ্যেস করলেন। ভুসুকু একটু চুপ করে থেকে বলল, 'না। তবে আমার খুব ভাল লাগছে।'

৩১

ভোরের আলো ফুটতেই যাত্রা শুরু করে দিলেন যুধিষ্ঠির। বৃহত্তর হস্তিনাপুরের সীমানা ছাড়িয়ে যাওয়ার পর দু-একটা ছোট গ্রাম। তারপর জনবসতীহীন ভূমি। একটু বন্ধুর ভূমি। কোথাও হালকা জঙ্গল, কোথাও ফাঁকা মাঠ। মাঝে মাঝে ঘাসভূমি। অনেককাল আগে এটাই ছিল হস্তিনাপুরে আসার অন্যতম প্রধান পথ। যমারণ্য বিপদজনক হয়ে ওঠার পর থেকে এই পথ পরিত্যক্ত হয়েছে। শুরুতে যমারণ্য নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেছিল কুরু সরকার। কিন্তু অরণ্যে প্রবেশ করে অসভ্য জাতির সঙ্গে যুদ্ধে জেতার জন্য বিরাট ক্ষতি স্বীকার করতে হবে জেনে হস্তিনাপুর পিছু হঠে। একবার ভাবা হয়েছিল যমারণ্যে আগুন ধরিয়ে বনবাসীদের বের করে আনা হবে। কিন্তু মুণি-ঋষিদের প্রবল আপত্তির কারণে সে ভাবনা পরিত্যক্ত হয়েছিল।

যুধিষ্ঠির ভেবেছিলেন যমারণ্যের সীমানার কাছাকাছি কোথাও সন্ধের আগে পৌঁছে যাবেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর এবং দলের সবার কানে হালকা কোলাহল ভেসে এল। নকুল ঘোড়া থেকে নেমে একটু ধুলো উড়িয়ে বায়ুর গতি ও দিক বুঝে নিলেন। তারপর কানের পেছনে তালু লাগিয়ে মন দিয়ে শুনলেন। শেষে বললেন, 'ওই উঁচু জমিটার ওপাড় থেকে।'

'সহদেব দ্রুত গাছে ওঠ।'

বড়দার নির্দেশ পেয়ে সহদেব প্রায় বাঁদরের মত দক্ষতায় একটা লম্বা গাছের মগডালের কাছাকাছি উঠে গেল কয়েক পলকে। চোখের ওপরে তালু লাগিয়ে নিরীক্ষণ করল সব কিছু। পুনরায় বাঁদরের মত তরতর করে নেমে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'বড় একটা বাহিনী। অশ্বারোহী নয়। মহিষ।'

'শিরস্ত্রাণগুলি কি স্বর্ণবৎ উজ্জ্বল?'

'কী করে বুঝলি?'

'মহিষাসুর!' অবাক যুধিষ্ঠির ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। 'তিনি কি হস্তিনাপুর ভ্রমণে আসছেন?'

ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই একটু থমকে গেল। শেষে মহাবলী বললেন, 'আমরা কি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব না পাশ কাটাব?'

'মহিষাসুরের নাম শুনেছি, কিন্তু বিশেষ কিছু জানা নেই।' ভীম বললেন। বাকি তিনভাই একমত হল। যুধিষ্ঠির তখন মহিষাসুর সম্পর্কে সংক্ষেপে অবহিত করলেন তাঁদের। মহিষাসুর প্রেম এবং বাণিজ্যে বিশ্বাসি। তাঁর নীতি হল, যুদ্ধ না করে ভালবাস আর বাণিজ্য কর। তাঁর ঘোষিত বাক্য হল 'সবার ট্যাঁকে মোহর'। রাজ্য তাঁর আছে। কিন্তু তিনি ঘুরে ঘুরে অসভ্য জাতিদের মধ্যে নিজের নীতি প্রচার করছেন। ফলও পেয়েছেন ভাল। এক কথায়, তিনি একটি প্রতিভা।

'চল তবে দেখা করেই যাই।' ভীম এবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

'ঠিক বলেছিস মেজো। পিতা পাণ্ডু এবং ছোটমা মাদ্রীর পারলৌকিক ক্রিয়ায় উনি হস্তিনাপুর এসেছিলেন। তোরা তখন শিশু। আমার আবছা আবছা মনে আছে।'

যুধিষ্ঠিরে কথায় সবাই সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে উঁচু জমিটার দিকে ছোটালেন। সে জমি বেয়ে উঠতেই সবার চোখে পড়ল মাটিতে ছড়িয়ে থাকা কালো মেঘের মত মহিষবাহিনী। উজ্জ্বল সূর্যলোকে ঝক ঝক করছে আরোহিদের শিরস্ত্রাণ। মহাবলী সহ পঞ্চপাণ্ডব ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিলেন।

ছয়জন অশ্বারোহীকে তাঁদের দিকে ছুটে আসতে দেখে মহিষাসুর বাহিনীর সেনাপতি সতর্ক হলেন। কয়েকজন মহিষারোহী গতি বাড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে অশ্বারোহীদের পথরোধ করল। ঘোড়াগুলি তাঁদের সামনে এসে দাঁড়াতেই তাঁদের নেতা জিগ্যেস করলেন, 'কে আপনারা? এটা মহামহিম মহিষাসুরের বাহিনী।'

'আমরা হস্তিনাপুরের বিশেষ দূত।'

ওদের নেতা বাহিনীর দিকে ফিরে কিছু সঙ্কেত পাঠালেন। ওদিক থেকে প্রত্যুত্তর এল। নেতা বললেন, 'আপনার যেতে পারেন।'

যুধিষ্ঠিরকে সামনে রেখে বাকিরা এগিয়ে গেলেন। মহিষগুলি সরে সরে তাঁদের পথ করে দিতে লাগল। যুধিষ্ঠির লক্ষ্য করলেন মহিষাসুরকে মাঝখানে রেখে অদ্ভুত একধরনের ব্যূহ রচনা করেছে মহিষগুলি। জন্তুগুলির মাথায় এবং দেহের দু-পাশে দৃঢ় বর্ম। ধাতুবিদ্যায় অতি গভীর জ্ঞান না থাকলে এই ধরনের পশুবর্ম তৈরি করা অসম্ভব।

মহিষাসুরের সামনে এসে ওরা দাঁড়াল। যুধিষ্ঠিরের ইঙ্গিতে মহাবলী একটু এগিয়ে গিয়ে মহিষাসুরকে প্রণাম জানিয়ে বললেন, 'আপনি কুরুরাজের সীমানায় অবস্থান করছেন। আকস্মিকভাবে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। আমার সঙ্গে হস্তিনাপুরের যুবরাজ যুধিষ্ঠির সভ্রাতা বর্তমান। তিনিই সাক্ষাৎপ্রার্থী!'

'অহো! পাণ্ডব!'

মহিষাসুরকে উল্লসিত দেখাল। লাফ দিয়ে আসন

থেকে নেমে দু-হাত বাড়িয়ে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'আয় আয়! বুকে আয় তোরা! সেই কত ছোট ছোট দেখে গেছি তোদের!'

আলিঙ্গনের পালা শেষ করে ভীমের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'শুনেছি তুই নাকি বেশ শক্তিমান। আয় তোকে অতিরিক্ত আলিঙ্গন করি।'

প্রশংসা শুনে ভীম লজ্জা লজ্জা মুখে আলিঙ্গনের জন্য হাত বাড়াতেই মহিষাসুর তাঁর বাহু দুটি ধরে দিলেন যুযুৎসুর প্যাঁচ। ধপাস করে ঘাসের ওপর আছড়ে পড়ে ভীম কাঁচুমাচু মুখে তাকাল ভাইদের দিকে।

'মল্লযুদ্ধের হাতেখড়ি হয় নি বুঝি?' খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসলেন মহিষাসুর। 'তা তোরা সব যাচ্ছিস কোথায়?'

'আপনি নিশ্চই যমারণ্য হয়ে এদিকে এসেছেন?'

'যমারণ্য এখন শান্তিপূর্ণ যুধিষ্ঠির! তবে দক্ষিণা দিতে হবে।'

'আপনি দু-একদিনের মধ্যে কোনও দলকে ওদিকে যেতে দেখেছেন নিশ্চয়ই?'

'একটা দলকে যেতে দেখেছি। ওরা নিজেদের বণিক বলছিল। আমার অবশ্যি তা মনে হয় নি।'

'কারণ?'

'ওরা ধূম্রকূট প্রয়োগ করছিল। অর্জুনকে জিগ্যেস করলেই জানবি ধূম্রাস্ত্র অতি উচ্চাঙ্গের সমরাস্ত্র।'

'বণিকদলের নিরাপত্তার পক্ষে অত্যধিক!' অর্জুন স্বীকার করল।

'অরণ্য সীমানায় একদল বনবাসী ওদের আক্রমণ করেছিল। আমি ওদের পিছু নিয়েছিলাম। ওরা সেই বণিকদলকে আক্রমণ করে। সে সময় বণিকদলের সেনারা আশ্চর্য রণকৌশলের পরিচয় দিয়েছে। আমার বিশ্বাস একদল উঁচু মানের যোদ্ধা বিশেষ উদ্দেশ্যে বেরিয়েছে। তবে যমারণ্যের ক্ষেত্রে তাঁরা ঠিক কৌশল নিতে পারেন নি। অরণ্য গভীরে ওই সব অস্ত্র অচল। বনবাসীদের হাতে ওদের ক্ষয়ক্ষতি অনেক হত। তবে এখন আর সে সম্ভাবনা নেই!'

কথা শেষ করে মহিষাসুর যুধিষ্ঠিরের খুব কাছে এসে ফিসফিস করে বললেন, 'যুবরাজ যুধিষ্ঠির ঠিক কী জানতে চাইছে?'

'আমার অনুমান ওরা আমার পরিচিত একজনকে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে।'

মহিষাসুর তখনই কিছু বললেন না। একটু পদচারণ করলেন বৃত্তাকারে। একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, 'তা হলে আর বিলম্ব না করে অগ্রসর হও। আমি হস্তিনাপুরে তোমার জন্য অপেক্ষা করব। আমার কাছে অতি উৎকৃষ্ট শুকনো ফল আছে। গান্ধার দেশের খর্জুর। আপাততঃ একেই উপহার রূপে স্বীকার কর।'

কিছু সময় পর যুধিষ্ঠির যখন বাকিদের নিয়ে পুনরায় যাত্রা শুরুর উদ্যোগ নিচ্ছেন তখন মহিষাসুর তাঁকে একান্তে ডাকলেন। বললেন, 'আমি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে হস্তিনাপুর যাচ্ছি। ভীষ্মের কাছে আমি একটি প্রস্তাব রাখব। আমি চাই তখন তুই উপস্থিত থাকবি।'

'তাই হবে।'

'হস্তিনাপুরকে তুই কেমন বুঝছিস?'

'একটা বিভেদের আবহাওয়া তৈরি হচ্ছে।'

'তোর বাবা পাণ্ডুদা আমাকে নিজের ভাই-এর মত ভালবাসতেন। পাণ্ডুদা ছিলেন খোলা মনের মানুষ। সে থাকলে এমন হত না। আর সে কারণেই সে থাকল না।'

যুধিষ্ঠির চমকে উঠে বললেন, 'মানে?'

'পাণ্ডুদা আর মাদ্রী বৌদিকে এমন কিছু খাইয়ে দেওয়া হয়েছিল যাতে দু-জনের সন্ন্যাস রোগ হয়। তাঁরা মৃগয়ায় বেরিয়ে ছিলেন। কুন্তী বৌদিরও যাওয়ার কথা ছিল। সে ক্ষেত্রে তিনজনই মারা যেত। এটা একটা পুরনো ষড়যন্ত্র।'

'এর লক্ষ্য কী?'

'পাণ্ডুদের নিশ্চিহ্ন করা।'

যুধিষ্ঠির নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর মনের মধ্যে তখন প্রবল আলোড়ন। এতদিন তিনি জানতেন যে বাবা আর ছোটমা মৃগয়া করতে গিয়ে রোগাক্রান্ত হয়ে মারা গেছিলেন। কিন্তু দু-জনেই যে একসঙ্গে সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হন— এ তথ্য নতুন।

'আমার মা কি এসব জেনেছিলেন?'

যুধিষ্ঠিরের গলার স্বর অবরুদ্ধ শোনাচ্ছিল। মহিষাসুরের মুখে বিষণ্ণ হাসি দেখা গেল। 'এ তথ্য কুরু বংশের মধ্যে তুই-ই প্রথম জানলি।' বললেন তিনি। 'ঘটনাটা তখনই জানা গিয়েছিল। কিন্তু মৃগয়ার সময় যে বৈদ্য সঙ্গে ছিল তাঁকে উৎকোচ প্রদান করা হয়েছিল। পরে তাঁকে কেউ হত্যা করে। সে বৈদ্য ভীষ্মকে জানিয়েছিল যে পাণ্ডুদা সন্ন্যাসরোগে মারা যান। শোক সহ্য করতে না পেরে বৌদিও দেহত্যাগ করেন।'

'আপনি জানলেন কী করে?'

'পাণ্ডুদা আর বৌদি তো আমার শিবিরের দিকে যাচ্ছিলেন! আমাদের তো একত্রে মৃগয়ায় যাওয়ার কথা ছিল।'

'আপনি জানেন কে হত্যা করেছিল?'

'তখন জানি নি। পরে জেনেছি।' মহিষাসুর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'এ এক দীর্ঘ ষড়যন্ত্র যুধিষ্ঠির। সৈন্ধবদের প্রতিশোধের ষড়যন্ত্র।'

মহিষাসুর নীরব হলেন। কিছুক্ষণ কেটে গেল। কেউ কোনও কথা বলল না। ক্রমে মনের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গগুলি শান্ত হয়ে এলে যুধিষ্ঠির বিদায় নিলেন।

যে করেই হক, ভুসুকুকে উদ্ধার করতেই হবে। সে-ই একমাত্র প্রমাণ।

৩২

দিনের প্রথম প্রহর সমাপ্ত হওয়ার কিছু আগে ভুসুকু একটি শক্তিশালী ঘোড়ার পিঠে উঠল। সঙ্গে আরেকটি ঘোড়া। তার পিঠে শীতের রাতে বাইরে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম। খাবার-দাবার। জল।

'এই ঘোড়াগুলি খুবই প্রশিক্ষিত।' পুন্ডরীকাক্ষ ভুসুকুর পিঠে দুটো আলতো চাপড় দিয়ে বললেন। 'যে দিকে যেতে চাইবে রাশ সেদিকে টানবে। পেছন দিকে টানলে থেমে যাবে। সামনের দিকে ঝাঁকালে ছুটবে। জোরে ছোটার দরকার নেই। দু-জন রক্ষী তোমাকে অরণ্যের সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে দেবে।'

ভুসুকু নীরবে মাথা নাড়াল।

অন্নরাজ অঙ্গার গভীরভাবে ভুসুকুর মুখমণ্ডল পর্যবেক্ষণ করছিলেন। সম্মোহনের পর প্রথম দু-দণ্ড খুব গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণেই অরণ্যের সীমা পর্যন্ত দু-জন তাঁকে চোখে চোখে রাখবে।

'যা বলেছি মনে আছে তোমার?'

অন্নরাজের প্রশ্নে ভুসুকু নির্বিকার মুখে বলল, 'হুঁ।'

'তোমার প্রথম কাজ?'

'আশ্রমে ফিরে যাওয়া।'

'তোমার কী হয়েছিল?'

'জানি না। ঘুমন্ত অবস্থায় আমাকে আপনারা উদ্ধার করেছিলেন।'

'আমরা কারা?'

'একদল বণিক।'

'তোমার দ্বিতীয় কাজ কী?'

'আশ্রমে অদত্তের সঙ্গে গোপনে শলাপরামর্শ করা।'

'বেশ।'

অন্নরাজ খুশি হলেন। সম্মোহনে কোনও ভুল হয় নি। পুন্ডরীকাক্ষের দিকে তাকিয়ে সহাস্যে বললেন, 'এবার তবে এঁকে জঙ্গলের সীমানায় পৌঁছে দাও। এ ছেলে আশ্রমে পৌঁছলে দুর্যোধনের কানে সংবাদ পৌঁছতে দেরি হবে না।'

ভুসুকু এরপর বেরিয়ে পড়েছিল দুই রক্ষীর সঙ্গে। অরণ্যের সীমানায় সে যখন পৌঁছল তখন বেলা গড়িয়ে গেছে অনেকটা। রক্ষী দু-জন বিদায় নেওয়ার পর ভুসুকু ঘোড়ার লাগামে মৃদু দুটো ঝাঁকুনি দিল। গতি বাড়িয়ে ঘোড়াটা এবার দৌড়োতে লাগল কপ কপ করে। ভুসুকু টের পেল ছুটন্ত ঘোড়ার আরোহি হওয়াটা চাট্টিখানি কথা নয়। জিনিসপত্র নিয়ে দ্বিতীয় ঘোড়াটা ঠিক পেছন পেছন ছুটে আসছিল। ভুসুকু চাইছিল সামনের ঘাসজমিটা অতিক্রম করে তারপর রাত কাটাবার আয়োজন করবে। ওদিকে একটা ছোট জলাশয় সে দেখেছিল আসার সময়।

ঘাসজমিতে দিক হারাবার ভয় ছিল। কিন্তু মহিষাসুরের বাহিনী চারদিকে চিহ্ন রেখে গেছে। ঘাসের মধ্য দিয়ে বেশ চওড়া পথ তৈরি হয়েছে একটা। প্রায় দেড় দণ্ড টানা ছোটার পর ঘাসজমি পেরিয়ে একটা সমতল ভূখণ্ডে এসে ভুসুকু রাশ টানল। এতক্ষণ সে কোনওমতে প্রায় দমবন্ধ করে ঘোড়ার ওপর নিজেকে স্থির রেখেছিল।

সূর্য ততক্ষণে কমলা হয়ে পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। এক দণ্ডের মধ্যেই আলো ফুরিয়ে অন্ধকার নেমে আসবে। কিন্তু ভুসুকু তাড়াহুড়ো করল না। ঘোড়া থেকে নেমে চারদিক একবার দেখে নিয়ে একটা বিরাট নিঃশ্বাস ফেলল। তার মাথা এখন পরিষ্কার। অন্নরাজ তাঁকে সম্মোহিত করার চেষ্টা করেছিল। সাময়িক ভাবে সেটা হয়েছিল ভুসুকু। কিন্তু তারপরেই সে নিজেকে আবার ফিরে পায়। এরপর সে যা করেছে পুরোটাই অভিনয়। কিন্তু অন্নরাজ তা ধরতে পারেন নি। সে তাঁর বিদ্যা নিয়ে নিশ্চিত ছিল।

'আমি সম্মোহিত হলাম না কেন?' বিড় বিড় করে নিজেকেই প্রশ্ন করে ভুসুকু। হস্তিনাপুর ফিরে গিয়ে তাঁর কী করা উচিত সেটা স্থির করে উঠতে পারছিল না সে। একবার তো ভেবেছিল, ঢের হয়েছে! নিজের দেশে ফিরে যাবে। কিন্তু পরক্ষণেই মধুক্ষরার মুখটা ভেসে উঠেছিল চোখের সামনে।

ভুসুকু স্থির করল যে হস্তিনাপুর ফিরে আগে মধুক্ষরাকে সব জানাবে। তারপর যুধিষ্ঠিরকে। নিশ্চই তাঁর নিরুদ্দেশ হওয়ার সংবাদ কোনওভাবে যুধিষ্ঠিরের কাছে পৌঁছেছে? তিনি যে ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের শিকার হতে যাচ্ছেন তা বুঝতে ভুসুকুর কোনও অসুবিধে হয় নি। ওদের দলবলের সঙ্গে থেকে অনেক বিষয় বুঝতে পেরেছে ভুসুকু। স্বয়ং

দুর্যোধন যে এঁদের পেছনে আছেন, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

চারদিক কেউ নেই। ভুসুকু দ্বিতীয় ঘোড়ার পিঠ থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে ঘোড়া দুটোকে ছেড়ে দিল। সে দুটো ছুটল জলাশয়ের দিকে। ভুসুকু নিজেও জল খেল মশক থেকে। তারপর লেগে পড়ল কাঠ যোগারে। অন্ধকার হওয়ার ঠিক আগেই সে চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালিয়ে ফেলল বড় করে।

এতক্ষণে স্বস্তি। ভুসুকু আরাম করে আগুনের পাশে বসল। থলে থেকে নুন মাখান মাংস বের করে পোড়াতে লাগল আগুনে। গপ গপ করে অনেকটা মাংস খেয়ে নতুন করে বল ফিরে পেল যেন।

তখনই তাঁর মনে হলে পেছনে কেউ আছে। চমকে তাকাতে গেল, কিন্তু একটা বলিষ্ঠ হাত তাঁর মুখ চেপে ধরলে সঙ্গে সঙ্গে। কেউ ফিসফিস করে কানের কাছে বলল, 'ভুসুকু?'

আতঙ্কে ভুসুকুর চোখ বড়ো হয়ে গেছে। কোনও মতে মাথা ঝাঁকিয়ে উত্তরটা জানাল।

'কোনও ভয় নেই।' হাতটা আলগা হয়ে সরে গেল। ভুসুকু ভয়ে ভয়ে তাকাল পেছনে। আগুনের আলোয় তাঁর পেছনে হাঁটু মুড়ে বসে আছেন এক অতিকায় পুরুষ। সর্বাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদিত। চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে কেবল।

অতিকায় পুরুষটি মুখের আবরণ সরিয়ে হাসিমুখে বললেন, 'কতদিন মাছের ঝোল খাচ্চি না বন্ধু!'

'ভীমসেন!' ভুসুকু হাঁ হয়ে গেল বিস্ময়ে!

'বাকি কথা পরে হবে বন্ধু! কাছেই আমাদের শিবির। এদিকে আগুন জ্বলছে দেখে আমি আর দাদা কৌতূহলি হয়ে এগিয়ে এসে তোমাকে দেখলাম। দাদাই চিনল তোমাকে।'

'যুধিষ্ঠির?'

'আমরা সবাই একসঙ্গেই আছি। চলো চলো! বাকি কথা শিবিরে হবে।'

কিছু বোঝার আগেই ভুসুকুকে দু-হাতে কাঁধে তুলে নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে দৌড়তে শুরু করলেন ভীমসেন।

৩৩

নয় সংখ্যক রাজপথের ধারে এক বাগানবাড়িতে জনৈক যাত্রীকে নামিয়ে উচ্চকপাল ঠিক করল এক দণ্ড বিশ্রাম নেবে। সকাল থেকেই পর পর যাত্রী পেয়েছে সে। উপার্জন ভালই হয়েছে। সামনেই একটা রসালয় দেখা যাচ্ছিল। সেখানে একটু সোমরস পান করবে বলে ভাবছিল উচ্চকপাল। কিন্তু একা একা গিয়ে মজা নেই। এদিক ওদিক তাকাতেই পেয়ে গেল কালকেতুকে। সে-ও রথচালক।

'ভো ভো কালকেতু! হাতে অবকাশ আছে?'

'আরে! উচ্চকপাল যে?'

কালকেতু রথ ঘুরিয়ে এগিয়ে এল। দেখা গেল রসালয়ে বসতে তাঁর বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। 'এখানে দু' ঘটি পান করলে এক ঘটি উপরি দেয় হে!' জানাল সে। 'নতুন খুলেছে কি না! ক্রেতা টানার জন্য এই কৌশল।'

'চলো চলো!'

দু-জন মিলে রসালয়ে প্রবেশ করল। মেঝেতে ছোট ছোট বিছানা। পানান্তে ঘুমিয়ে পড়লে অসুবিধে নেই। রসপানের পর মিষ্টান্ন খেতে ইচ্ছে হলে তা-ও পাওয়া যাবে। সব মিলিয়ে চমৎকার আয়োজন।

ফলে দু-জন কিছুক্ষণের মধ্যেই দুই ঘটি করে সোমরস পান করার পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

'মহাশয়রা মনে হচ্ছে তুরীয় মার্গে?'

পাশ থেকে একজন অচেনা ব্যক্তি জিগ্যেস করলেন। 'একটু আলাপ হতে পারে কি?'

'নিশ্চয়ই! চলে আসুন এই বিছানায়। আপনার জন্য বলি এক ঘটি?'

'আর দরকার নেই।' ব্যক্তিটি কালকেতুকে নিরস্ত করলেন। প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ওদের বিছানার কোণায় এসে বসে বললেন, 'তুরীয় মার্গে আছেন তাই একটি বিষয় নিয়ে আপনাদের মত জানতে চাই। আমার নাম ভানু। হস্তিনাপুর আর্য সমিতির দক্ষিণ মণ্ডলের উপ সম্পাদক।'

'বাঃ বাঃ! কিন্তু আর্য সমিতিটা কী বস্তু?'

'তার আগে বলুন আপনারা কি হস্তিনাপুরি?'

'বিলক্ষণ! আমি এবং আমার বন্ধু উচ্চকপাল দু-জনেই বিশুদ্ধ হস্তিনাপুরি।'

'তা হলে আপনারা দু-জনই আর্য।'

ভুসুকু আরাম করে আগুনের পাশে বসল। থলে থেকে নুন মাখান মাংস বের করে পোড়াতে লাগল আগুনে। গপ গপ করে অনেকটা মাংস খেয়ে নতুন করে বল ফিরে পেল যেন। তখনই তাঁর মনে হলে পেছনে কেউ আছে। চমকে তাকাতে গেল, কিন্তু একটা বলিষ্ঠ হাত তাঁর মুখ চেপে ধরলে সঙ্গে সঙ্গে। কেউ ফিসফিস করে কানের কাছে বলল, 'ভুসুকু?'

'এবার বুঝেছি।' উচ্চকপাল অনেকটা হাসল। 'এই রকম শুনেছিলাম বটে। হস্তিনাপুরিদের আর্য বলার দাবি উঠছে কোথাও কোথাও। ভাল! বেশ মজার ব্যাপার!'

'মজা নয়! বিষয়টি অতি গম্ভীর। আমরা এ বিষয়ে জনমত তৈরি করছি।'

'আমরা নিজেদের আর্য বললে কি সোমরসের মূল্য কম নেওয়া হবে? —কী বলো উচ্চকপাল?'

'ঠিক। তা ছাড়া হঠাৎ করে আমরা আর্য হব কেন? আর্য মানে কী?'

ভানু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আর্য মানে জানেন না? আর্য মানে সেরা। আমরা হলাম সবার সেরা জাতি।'

'হে হে হে!' ভারি আমোদ পেলেন উচ্চকপাল। 'অসুররা থাকতে আমরা শ্রেষ্ঠ! এটা কিন্তু খুব হাসির কথা ভাই!'

'অসুরদের শ্রেষ্ঠ ভাবাটা আসলে অসুরতোষণ। আমরা এর বিরুদ্ধে!'

কালকেতু বেশ মজা পেল কথাটা শুনে। বলল, 'ঠিক আছে মহাশয়! আপনি নিজেকে আর্য বলুন। আমাদের আপাততঃ অনার্যই থাকতে দিন।'

'মানে আপনারা নিজেদের আর্য পরিচয় দিতে অসম্মত?'

'আমরা যে হস্তিনাপুরি তার প্রমাণ কী?'

'কেন? আপনাদের জন্ম হস্তিনাপুর সাম্রাজ্যে!'

'সে তো অসুর পাড়ায় শিশু অসুরগুলোও জন্মেছে। তাঁরা কি হস্তিনাপুরি? যদি হস্তিনাপুরি হয় তবে আমরাও তাই। তাই যদি হয় তবে অসুরও আর্য।'

'শারীরিক বৈশিষ্ট্য বিচার করতে হবে। হস্তিনাপুরিদের বৈশিষ্ট্য হল উন্নত নাসা।'

'আমরা কি উৎনাসিক উচ্চকপাল?'

'ছেড়ে দাও ভাই।' উচ্চকপাল গম্ভীর হলেন। 'আর্যরা ভাল, বাকিরা ভাল না— এমন নীতি হস্তিনাপুরে অচল।'

'কে বলেছে অচল?' ভানু লাফিয়ে উঠল প্রায়। 'ভূতমিত্রের আশ্রমের ছাত্রদের অনেকেই এই নীতিকে সমর্থন করছে। ওই আশ্রমের স্নাতকদের মতামতের যে আলাদা গুরুত্ব আছে সেটা মানেন তো?'

'আশ্রমিকরা এমন ভাবছে?' কালকেতু থতমত খেয়ে গেল। 'আশ্রমিকরা কী ভাবছে তা আপনি জানেন?'

'না জানার কী আছে? আমাদের তো দুটি প্রধান দাবি। একটা হল, আর্যামি। আরেকটা হল যুবরাজ রূপে দুর্যোধনকে মনোনীত করা।'

'আশ্রমিকরা এই দুটো নীতির পক্ষে?'

'সবাই যে পক্ষে তা বলব না। তবে অনেকেই। সংখ্যাটা বাড়বে। যুবরাজ রূপে দুর্যোধন অনেক চমকপ্রদ।'

আরেক পাশে একজন গৈরিকধারী সাধু ধ্যানস্থ হয়ে তুরীয় মার্গে বিচরণ করছিলেন। এবার তিনি চোখ খুলে ভর্ৎসনার সুরে বললেন, 'এই যে বাপু ভানু! হস্তিনাপুর সহস্র জাতির মিলনতীর্থ। অর্বুদ মতের সংশ্লেষ। দুর্যোধন মহাবীর। কিন্তু কেবল বীরত্ব দিয়ে প্রজাপালন হয় না। অহেতুক বক বক করে সোমরসের মজা নষ্ট করে দিচ্ছ। অন্যত্র হলে অভিশাপ দিতাম!'

সাধু পুনরায় ধ্যানস্থ হলেন। ভানু আর কথা না বাড়িয়ে কেটে পড়ল। উচ্চকপালকে দেখা গেল বিমর্ষ চিত্তে বসে থাকতে। কালকেতু সেটা লক্ষ্য করে বললেন, 'উপরি এক ঘটি করে প্রাপ্য আছে। সেটা দিতে বলি?'

'বলো।'

দুটি রসপূর্ণ ক্ষুদ্র কলস নিয়ে এল কালকেতু। নবীন রসালয়ের সোমরস সত্যিই উৎকৃষ্ট। পার্বত্য অঞ্চলের বিশেষ সোমলতা ব্যবহার করছে তাঁরা।

'তোমায় একটা কথা বলি সখা।' উচ্চকপাল রসপান করে একটু উৎফুল্ল হয়। 'ভূতমিত্রের একজন অসুর মাহুত আছে। তাঁর নাম ভুসুকু।'

'কে না চেনে তাঁকে? তবে আলাপ হয় নি।'

'ছেলেটা কয়েক দিন ধরে নিরুদ্দেশ।'

'তার জন্য তোমার এত বিষণ্ণতা?'

'আমার মেয়ে মধুক্ষরা তাঁর প্রতি অনুরক্ত। তাঁর মা বলেছে আমাকে। মেয়েটা মুখে কিছু বলছে না, কিন্তু মুখ দেখলে বুঝতে পারি প্রবল উৎকণ্ঠায় রয়েছে।'

কালকেতু একটু ক্ষণ চুপ করে থেকে ফিক ফিক করে আপন মনে হাসতে লাগল।

'হাসছ যে?'

'আর্যপুত্রের অসুর জামাই! ভানু শুনলে মূর্ছা যেত।'

(ক্রমশ)

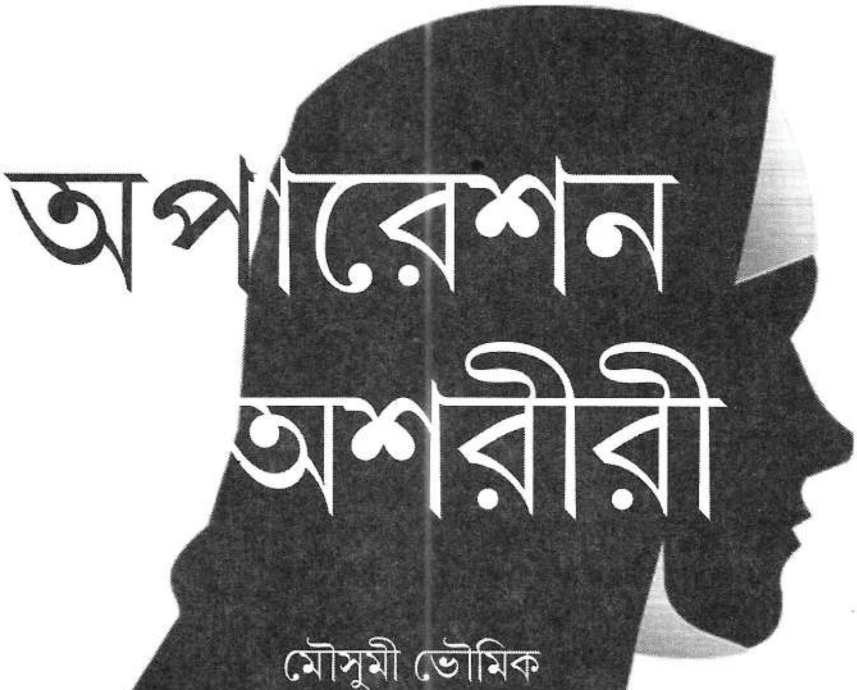

অপারেশন অশরীরী

মৌসুমী ভৌমিক

অপার সৌন্দর্যের মায়াজাল বিছানো ছোট্ট পাহাড়ি শহর। টানা পাহাড়ের উপর রাস্তাঘাট, সুদূর তিব্বতের মাঝ দিয়ে বয়ে আসা তিস্তাকে একপাশে রেখে এঁকে বেঁকে উঠে এসেছে উপরে, পাইনের ঘন জঙ্গলকে সঙ্গী করে। বৃষ্টি আর মেঘের খেলা দেখতে পাওয়া এই শহরে পুতুলের বাড়ির মত দেখতে ছিল সেন্ট জোসেফ'স কনভেন্ট। ঋষি রোডের আটমাইলের এই স্কুলটি আমার কাছে আরও প্রিয় ছিল কারণ কাঞ্চনজঙ্ঘা। স্কুলের খেলার মাঠ থেকে দেখা যেত গরবিনীকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়েই এই স্কুলের চাকরিটা পেয়ে গিয়েছিলাম। তাও আবার সেটা জলপাইগুড়িতে নয়, কালিম্পঙে। প্রথমে বাবা-মায়ের কাছে একেবারেই পাত্তা বিশেষ পাই নি। বিশ্বাসই করে নি আমি দুম করে একটাচাকরি পেয়ে যেতে পারি। মানে আমার মত শাখামৃগের উপর তাদের বিন্দুমাত্র কনফিডেন্স মোটেও ছিল না।

"হুহ্, এক গ্লাস জল নিয়ে যে খেতে পারে না, সে নাকি করবে চাকরি? তাও আবার থাকবে হস্টেলে?" মায়ের ব্রহ্মাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ধেয়ে এসেছিল বাবার আগ্নেয়াস্ত্র "বলি, বাড়ির বাইরে

রাত বাড়লেই কনভেন্টের ক্যাম্পাস সুনসান আর ছমছমে হয়ে উঠত। সন্ধে সাতটার পর মূল শহর থেকে বিদ্যুতের যোগান বন্ধ হয়ে যেত। কনভেন্টের নিজস্ব জেনারেটরের গুমগুম আওয়াজ আর টিমটিমে আলোয় অতবড় ক্যাম্পাসটা বেশ ভুতুড়ে হয়ে উঠত। রাতের খাবার শেষে আমাদের সাতজনের গল্প শুরু হত। নানারকম অদ্ভুত সব মৃত্যুর গল্প আর রহস্যময় ঘটনা আসতই। সব শুনে ভয়ে এতটুকু হয়ে আমার রাতজাগা জীবন চলত।

আমাদের ছেড়ে কখনও একা থেকেছ? ভূতের ভয়েই তো কাবু থাকো। সামলাবে কে শুনি?" যাইহোক, কয়েকদিন ধরে বেশ কয়েক কেজি মাখন মাখিয়ে তাদের শান্ত করে আমি বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে রওনাদিলাম সেন্ট জোসেফ'স কনভেন্ট, কালিম্পং।

চাকরিতে যোগ দেবার এক সপ্তাহ আগে আমাকে একবার আসতে হয়েছিল আমার থাকার জায়গাটি দেখে যেতে। প্রিন্সিপাল মহাশয়া টিচার'স কোয়ার্টারের দ্বিতীয় ঘরটিই আমাকে দেখালেন। পছন্দও হল বেশ। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বাঁ হাতে ঘরটি। প্রিন্সিপালের রুমে ফেরার সময় উনি জিজ্ঞেস করলেন আমার কোনও কিছুতে অ্যালার্জি আছে কিনা। আমি খুব নিরীহ মুখ করে বললাম "ইয়ে, ঐ মানে আর কী, ভূতে"। উনি একখানা ভুবন ভোলানো হাসি দিলেন। ভগবান, তখন যদি জানতাম এ হাসির রহস্য! সময়মত চাকরিতে যোগ দেবার পর প্রথম ধাক্কা— আমার থাকার ঘরটি পাল্টে গিয়েছে। প্রথমের কোয়ার্টারটি ছিল স্কুলের নিজস্ব কবরখানার পাশেই। স্কুল অথরিটি আমাকে থাকতে দিলেন কবরখানার একদম লাগোয়া ঘরে। জানালা খুললেই সার সার ওবেলিস্ক বসানো কবর দেখা যেত। আর কবরখানার ঠিক মাঝখানে যিশুখ্রিস্ট দুহাত ছড়িয়ে মাথা লটকে ঝুলে একটি ক্রসে। সন্ধে হলেই ওনার নীল কাঁচের চোখ দুটো জ্বলে উঠত। সব মিলিয়ে আমাকে কাবু করে রাখার বা ভাগাবার বেশ ভাল বন্দোবস্ত আর কী! বাবা-মায়ের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ বা ডীল হয়েছিল কিনা জানি না। সে যা হোক বাইরে থেকে আসা মোট সাত জন শিক্ষিকা ছিলাম আমরা কোয়ার্টারটিতে। বাকী রুমগুলো ফাঁকাই পড়ে থাকত।

চারদিক পাহাড় ঘেরা এক ভারি মনোরম জায়গা। শান্ত পরিবেশ, শুধু দূরে বয়ে চলা তিস্তার গুরু গম্ভীর হাল্কা আওয়াজ ভেসে আসে। কখনও কখনও দূর থেকে বাঁশি বাজানোর আওয়াজ শোনা যায় রাতে। আর আমি? আমি প্রথম দিকের রাতগুলো জেগেই বসে থাকতাম প্রায়ই অজানা অদেখা ছায়াহীন শরীরগুলোর ভয়ে। রাত বাড়লেই কনভেন্টের ক্যাম্পাস সুনসান আর ছমছমে হয়ে উঠত। সন্ধে সাতটার পর মূল শহর থেকে বিদ্যুতের যোগান বন্ধ হয়ে যেত। কনভেন্টের নিজস্ব জেনারেটরের গুমগুম আওয়াজ আর টিমটিমে আলোয় অতবড় ক্যাম্পাসটা বেশ ভুতুড়ে হয়ে উঠত। রাতের খাবার শেষে আমাদের সাতজনের গল্প শুরু হত। নানারকম অদ্ভুত সব মৃত্যুর গল্প আর রহস্যময় ঘটনা আসতই। সব শুনে ভয়ে এতটুকু হয়ে আমার রাতজাগা জীবন চলত। দিনের বেলা ক্লাস নিতে গিয়ে বার বার হাই লুকোতাম, বিকেলে ঘরে ফিরে ঘণ্টাকয়েক মরার মত ঘুমোতাম, যতক্ষণ না খাবারের ডাক আসে।

এইভাবেই ছয় মাস কাটিয়ে দিলাম। জুন মাসে ছুটিতে এলাম বাড়ি। এসে টের পেলাম বাবা-মা অনেক শান্ত, আর আমি মিস করছি আমার স্কুলের কোয়ার্টার জীবন। পনেরটা দিনের ছুটি এদিক ওদিককরে কাটিয়ে কনভেন্টে পৌঁছাবার পর রাতের বেলা ডাইনিং হলে খেতে বসে শুরু হল আড্ডা। খাওয়ার পর সবাই মিলে আমার ঘরে এসে বসল। ঘরে ফিরেও আমাদের গল্প যেন আর ফুরোচ্ছিলই না। কয়েকদিনের ছুটিতেই কত্তো কথা জমে গিয়েছে! ছুটিতে কে কত মোটা হল, কার প্রেমিক

বড্ড অভিমান করেছে— এইসব নানারকম আলোচনায় আমরা ব্যস্ত থাকলাম অনেকক্ষণ। রাত কত হল, হুঁশ নেই কারও। আমি ব্যাগ থেকে জিনিসপত্র বের করে আলমারিতে গুছিয়ে রাখতে রাখতে অনর্গল বকে যাচ্ছি। বাড়ি থেকে আনা নারকেলের নাড়ুর বয়াম আমাদের বকবকের সঙ্গে সঙ্গে খালি হয়ে চলেছে।

আলমারি গোছাতে গোছাতেই খেয়াল করলাম সহকর্মী সরোজা 'এখুনি আসছি' বলে বেরিয়ে গেল। ফিরে এল দুটো শিশি হাতে নিয়ে। ঘরে ঢুকে আমাদের সবাইকে দেখিয়ে সেই দুটোর গুণকীর্তন করতে লাগলো। একটা শিশির পেস্ট নাকি চুলে লাগালে মাখলে কুঁচবরণ চুল হবে আর দ্বিতীয়টা নাকি দৈব ওষুধ। মাখলে নাকি একমাসের মধ্যে আমি দেখতে নিকোল কিডম্যানের মতো হয়ে যাব। এই পেস্ট নাকি ওর ঠাকুমা ওকে বানিয়ে দিয়েছে। আমি যথারীতি রসগোল্লার মত ইয়াব্বড় চোখ আর মাছি গলে যাওয়া মুখ করে ওর দিকে তাকিয়ে ওর বিজ্ঞাপনোচিত হাত-পা নাড়া দেখতে লাগলাম আর ভেতরে ভেতরে প্ল্যাস্টিক সার্জেনদের ব্যবসা বন্ধ হবার আশঙ্কায় হু হু করে কেঁদে উঠলাম। ডরোথি উপদেশ দিল সরোজাকে এই দুটো পেস্টের ব্যবসা শুরু করার। সঙ্গে সেও থাকবে বলল।

ডরোথি ঠিক করল কালিম্পঙে ব্যবসা শুরু হবার পর ক্রিমদুটো বলিউডে পাঠাবে, যাতে কোনও ডিরেক্টর খুশি হয়ে তাকে ডেকে পাঠায়। ডরোথির আবার বড্ড নায়িকা হবার শখ। ব্যবসায়িক বুদ্ধিটা আবার আমার আর এক সহকর্মী উরশুলা টোপোঁর বরাবরই ভালো। বিদেশে এই পেস্ট রপ্তানি করে আমরা অচিরেই মহিলা উদ্যোগপতি হিসেবে বিশাল কোটিপতি হতে যাচ্ছি। এই ব্যাপারটা যখন সে আমাদের প্রায় বিশ্বাস করিয়ে এনেছে ঠিক তখনই বেরসিকের মতো বাদ সাধল লোডশেডিং। জেনারেটর হঠাৎ চুপ করে গেল চারদিক অন্ধকার করে দিয়ে। ডরোথি চরম বিরক্তি নিয়ে বলে উঠল, "এই জন্যেই তো বলিউড চলে যাব। খালি একবার এই পেস্টটা পাঠিয়ে নিই। ওখানে কোনও লোডশেডিং নেই।"

আমি সমস্ত কিছুতে এমনিতেই ভেবলে ছিলাম। ঘটঘট করে ডরোথির কথায় মাথা নেড়ে সায় দিয়ে দিলাম। কনভেন্টে মোমবাতি জাতীয় কিছু নিজের কাছে রাখা রীতিমত অপরাধ ছিল। অতএব অন্ধকারে কিছুক্ষণ গজগজ করে সুবোধ বালিকার মত সবাই আমার ঘরেই চুপচাপ গাদাগাদি করে শুয়ে পড়লাম। সরোজা অবশ্য হাল ছেড়ে দেবার পাত্রী নয়। "মৌ, তোমার নাইট ক্রিমটা কোথায় গেল?" করে অন্ধকারেই বিছানা হাতড়াতে লাগল। কিছুক্ষণ পর 'এই যে পেয়েছি' শুনলাম।

"কী রে সরোজা, শুবি না?" ক্রিস্টিন জিজ্ঞেস করতেই সরোজা উত্তর দিল "ক্রিমটা মেখেই আসছি।"

টুকটাক দু'একটা কথার পর সব চুপচাপ।

হঠাৎ করেই কানে এল একটানা সুর করে কান্নার আওয়াজ। সাথে ঝুমঝুম শব্দ। যেন কোনও অশরীরী আত্মা গভীর বেদনায় আর্তনাদ করে চলেছে। আমি থরথর কেঁপে উঠে আমার পাশে শুয়ে থাকা কোনও একজনের উপর চেপে বসলাম। তার চি চি আওয়াজে আমি গেলাম আরও ঘাবড়ে। আরও জোরে তাকে ধরলাম চেপে। ডরোথি ইতিমধ্যেই ফিসফিস করে জানিয়ে দিল, কবরখানায় নাকি ভূত আছে। একথা শোনার পরে আমার পেটে প্রবল গুড়গুড় শুরু হল। গলা শুকিয়ে কাঠ। হঠাৎ ক্রিস্টিনের গলা শোনা গেল "ওঠো সবাই, বাইরে যাব দেখতে।"

কী ভয়ানক মেয়ে রে বাপ! একটু আধটু গাঁই গুঁই করেও ক্রিস্টিনের নেতৃত্বে বাকিরা পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল শব্দের উৎসের দিকে। আমাকে

ধীরে ধীরে শব্দের একদম কাছাকাছি পৌঁছে গেছি আমরা। দরজায় দাঁড়িয়ে স্পষ্টই বুঝতে পারলাম শব্দটা ভেতর থেকেই আসছে। "ও মাগো বাবাগো। আর তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে না গো!" হঠাৎ ডুকরে উঠলাম আমি। বাকিরা আমাকে এক ধমকে চুপ করিয়ে দিল। ঘরের ভেতরের আওয়াজও সেইসঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল। আমি নিজের দাঁতের ঠকঠকানি ছাড়া আর কিছু শুনতে পারছিলাম না।

প্রায় বগলদাবা করে আর এক সহকর্মী ডলি পা বাড়াল ওদের সঙ্গে। আবার আমার চি চি করার পালা। বাইরে বেরিয়ে দেখি চাঁদের খুব হাল্কা আলো রয়েছে। ঘন কুয়াশা রয়েছে তার সঙ্গে। যথেষ্ট গায়ে কাঁটা দেওয়া ভৌতিক পরিবেশ। আমি ভাবছিলাম আজই আমার শেষ রাত। বাবা-মায়ের আপত্তি উপদেশকে পাত্তা না দেওয়ার ফল আজই পেয়ে যাব হাতে নাতে।

এরপর সবার মনযোগ গেল আওয়াজে। আমাদের কোয়ার্টারের একেবারে শুরুর দিকের ঘরটা থেকে আসছে মনে হল শব্দটা। ওরে বাবা। আর কে বাঁচায় আজ আমাদের! ওই ঘরটাতেই একজন খ্রিষ্টান সন্ন্যাসিনী বছর পাঁচেক আগে ঘুমের ওষুধ খেয়ে মারা যান। তারপর থেকে ঘরটা বন্ধই থাকে। হৃদপিণ্ডের ধুকপুকুনি কতগুণ বেড়ে গিয়েছে বোঝানো মুস্কিল। কিন্তু ক্রিস্টিন অকুতোভয়। তাই তার পেছনে সবাই এগিয়ে চলেছি দেওয়াল ধরে ধরে। এই অভিযানের মধ্যেও সরোজার কিন্তু মুখে নাইটক্রিম মাখা বন্ধ হয় নি, চলছেই। আমি একবার তাকিয়ে দেখলাম একটা ছোট শিশি রয়েছে ওর হাতে।

ধীরে ধীরে শব্দের একদম কাছাকাছি পৌঁছে গেছি আমরা। দরজায় দাঁড়িয়ে স্পষ্টই বুঝতে পারলাম শব্দটা ভেতর থেকেই আসছে। "ও মাগো বাবাগো। আর তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে না গো!" হঠাৎ ডুকরে উঠলাম আমি। বাকিরা আমাকে এক ধমকে চুপ করিয়ে দিল। ঘরের ভেতরের আওয়াজও সেইসঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল। আমি নিজের দাঁতের ঠকঠকানি ছাড়া আর কিছু শুনতে পারছিলাম না। এবার ভেতরে ঢুকে পড়ব নাকি ঘুরে দৌড় লাগাব ভাবছি, ডলি দরজার হাতলে হাত রেখে বলল, "একবার দরজাটা ধাক্কা দিয়ে দেখি, দাঁড়াও।" সবাই মিলে সজোরে ধাক্কা দিতেই হুড়মুড় দরজা খুলে ঢুকে পড়লাম। আর ঠিক তক্ষুনি জেনারেটরটা গুমগুম করে স্টার্ট দিতেই টিমটিম করে সব আলো জ্বলে উঠল।

রুমের ভেতরটা মোটামুটি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। তাতে যা বোঝা গেল, কনভেন্টের গুটিকয়েক প্রৌঢ় সন্ন্যাসিনী ওই ঘরে শুতে এসেছিল। লোডশেডিং হওয়াতে সময় কাটাতে একজন একটি গান ধরেছিল। কিন্তু তার অসাধারণ সুরের কারণে আমরা সেই গানকে অশরীরীর কান্না ভেবে ভয়ে আধমরা হয়েছি সবাই। আর সেই যে ঝুমঝুম শব্দ— সেটি আর কিছু নয়, আর একজন সিস্টার সামান্য এক ঝুমঝুমি বাজাচ্ছিলেন। আমাদের ওভাবে হুড়মুড় করে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়তে দেখে ওরা গানবাজনা থামিয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল।

আমরা হাসি চেপে রাখতে রাখতে লজ্জায় পালাবার পথ খুঁজছি। হঠাৎ সরোজার দিকে নজর যেতেই আবার আঁতকে উঠলাম। আঁ আঁ করে চিৎকারে আমি একলাফে ডরোথির ঘাড়ে গিয়ে পড়লাম। আর দুজনেই তারপর একসঙ্গে ধপাস। ডরোথি এক ধাক্কা দিয়ে আমাকে সরিয়ে সরোজার দিকে ভেবলে গিয়ে তাকিয়ে থাকল। তারপর আবার সমবেত হাসির শব্দ শুনে একটা চোখ কোনওমতে খুলে বুঝলাম যে লোডশেডিং-এর অন্ধকারে নাইটক্রিমের পরিবর্তে মুখে কালচে রঙের কিছু মাখাতে সরোজাকে দেখতে বলিউডের ভূতের মত হয়ে গিয়েছে।

অপারেশন অশরীরী প্রবল ফ্লপ হবার পর ঘরে ফিরে এসে অশরীরী মেকআপ নেওয়া সরোজা তিন-চার-পাঁচ-ছয় অক্ষর বিশিষ্ট তার জীবনের সেরা বিশেষণগুলো অভিধান উজাড় করে দিয়ে ওই ঠান্ডায় মুখ পরিষ্কার করতে বসল। ওই কালচে সবুজ রঙের জিনিসটা আসলে ছিল ওর ঠাকুমার বানানো চুল কালো করার সেই পেস্ট, অন্ধকারে ভুল শিশি হাতে পড়ে গিয়েছিল।

এরপর টানা তিন বছর ছিলাম কনভেন্টে। আমার ভূতের ভয় কাটাবার জন্য মাঝেমধ্যে প্রিন্সিপাল আমাকে নিয়ে কবরখানায় ঢুকতেন। প্রথম প্রথম ওনার হাত শক্ত করে ধরে কবরখানায় দু'পা হেঁটেই দৌড়ে পালিয়ে আসতাম। আস্তে আস্তে হাঁটার পরিমাণ বাড়ল। ক্রমশ ভূতের ভয় কোথায় যে হারিয়ে গিয়েছিল, কে জানে!

তবে হ্যাঁ, এখন মানুষকে বড্ড পাই আমি।

উত্তরের উপকথা

তরাই বনের কিংবদন্তী

বন-বনানী প্রজাপতি ফুল ঝর্ণা পশুপাখি ছাড়াও আরেকটি দুর্লভ টানে ডুয়ার্সে টুঁ মারা যায়, সে টান রসনার, সে টান জিভের তৃপ্তির। আমিষ নিরামিষ ঝাল নোনতা টক মিষ্টি রান্নার এমন আশ্চর্য (পড়ুন আজব) কেরামতি আর কোনও মুলুক দেখাতে পারে কিনা সন্দেহ থাকবে। ভাজা সেঁকা পোড়ানো ডোবানো কুচোনো ঢোকানো চাপানোর কত তরিবতের ব্যঞ্জনই না ডুয়ার্সবাসী জানেন। বিফ হ্যাম মাটন চিকেন মাশরুম ডিম মাছ পনীর সয়াবিনের ভারতীয় তিব্বতি চীনা ইতালিয়ান নানান পদ পাত পেড়ে খেতে খেতে রান্নার বিশ্বরূপ দর্শন হয়ে যেতে বাধ্য। কালো লাল সবুজ চা অথবা ভাত আলু জোয়ারের ভুট্টার নানান কিসিমের পানীয়, নানরকম পাহাড়ি হার্ব, ট্রি-টমেটো, ক্যাপসিকাম আদা দিয়ে রাঁধা কোয়াশ, ডাল্লে, লেবু, ডাল-চাল-গম-ডালিয়া- কাওন ইত্যাদির নানান নিরামিষ ব্যঞ্জনেও ডুয়ার্সের চড়াই সমৃদ্ধ।

তবে উতরাইও কিছু কম যায় না। ফুলকপি বাঁধাকপি আলু বিটগাজর তো বাদই দিন, চর্বিঅলা খাসির ঝোল, বোরোলির চচ্চড়ি, বোয়াল-আড়ের পাতুরি, শুঁটকির ছাকা প্যালকায় ডুয়ার্সের হেঁশেল মাতোয়ারা। শুধু কি তাই, শুনেছি চোরাশিকারিরা নাকি চিতাবাঘের মাংসও কষিয়ে রেঁধে পিকনিক সেরে ফেলেছে। পরে তাদের জেল হোক বা বেল, খাওয়া গেলে খাওয়া নাই/ মরলে জনম আছে।

মরলে জন্ম আছে কি নেই সেও ভারি বিতর্কের প্রশ্ন। আর সে প্রশ্নটাই উস্কে দেয় যখন তরাইয়ের একটি জঙ্গুলে কিংবদন্তি খুঁজে পাই। কিংবদন্তিকে লোককথার একটি অন্যতম শাখা বলা যায়। কল্পকথার এই গল্পগুলির সঙ্গে বাস্তবের মিল হয় না, বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি থাকে না কিন্তু লোকবিশ্বাস থাকে খাঁটি। যাঁরা তরাইকে হাতের তালুর মতন চেনেন জানেন তাদের হয়ত খাবারদাবারগুলির মত এ গল্পও ভীষণ জানা। কিন্তু যারা শোনেন নি বা শুনেছিলেন ভুলে গেছেন তাদের জন্য গল্পটা আরেকবার লিখলাম। কোথায় পেলাম বললে কায়দা করে উত্তর দিতে পারি, সংগৃহিত।

অনেক কাল আগের কথা।

পাহাড়ে তখন শুধুই গাছেদের রাজ্য। পাইন পিপ্পলি উতিশ খয়ের মহুয়া গুরাস দেওদার ইত্যাদি গাছের পাড়ায় হঠাৎ বিয়ের যুগ্যি হয়ে বেড়ে উঠল এক লালিগুরাস (রডোড্রেনড্রন) কন্যা। নয়া যুবতীর রঙে রঙিন মন, সব সময় প্রজাপতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উড়ু উড়ু করে, ঘরে থাকতে চায় না মোটে।

একদিন হাড়কাঁপানো শীতের মধ্যেই সে বেরিয়ে পড়ল পাড়া বেড়াতে। এখানে সেখানে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ তার নজর পড়ল এক ভরা জোয়ান উতিশ (হিমালয়ান অল্ডার) গাছের দিকে, পাহাড়ের মাথায় টানটান দাঁড়ানো উতিশ কুমারের অমন বলিষ্ঠ সতেজ চেহারা দেখে প্রথম দর্শনেই গুরাস কন্যা তার প্রেমে মজল। তবে মনের কথা সে কাউকে জানতে দিল না, ঘরে ফিরে এল।

কিন্তু প্রেম কি লুকোনো যায়? লালিগুরাস কন্যার উথাল পাথাল অবস্থা সব্বার নজরে পড়ল। পাড়াপড়শিরা এ ওর ডালে ডাল ঘেঁসিয়ে হাসতে লাগল, বরফ গুঁড়ো ঘাসের সঙ্গে ফিসফিসিয়ে তার কথা আলাপ করতে লাগল। বাতাসও এগাছ সেগাছে কানাকানি করতে করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সব্বার এক কথা, লালিগুরাস প্রেমে পড়েছে।

বুড়ো পিপ্পলির আর সহ্য হলো না। ওইটুকু মেয়েটা মনে মনে কষ্ট পাবে আর সবাই তাকে নিয়ে হাসবে সেটা হতে পারে না। সে নিজে থেকেই লালিকে ডেকে বলল, দ্যাখো এভাবে একা একা কাউকে ভালবাসলে কষ্টই পাবে শুধু। বরং প্রিয়জনকে মনের কথা খুলে বল গিয়ে। এতে মনও হালকা হবে, তার মনের কথাও তোমার জানা হয়ে যাবে।

খুবই ভাল পরামর্শ। লালি আর দেরি করল না। সোজা চলে গেল উতিশের কাছে। লাজলজ্জা ঝেড়ে জানাল লালি তাকে বিয়ে করতে চায়, তার সঙ্গে জীবন কাটাতে চায়।

উতিশ কিন্তুভীষণ বিরক্ত হল। ওই কুঁজওয়ালা কোঁচকানো শরীরের মেয়েটা তার মতন সুঠাম তরুণকে বিয়ে করতে চায়, কতবড় সাহস! দূর দূর করে উতিশ তাড়িয়ে দিল লালিকে।

জীবনে প্রথমবার লালি জানল দুঃখ কাকে বলে। সে মনে মনে ভাবল, এ পৃথিবীতে কত গাছ আছে। কেউ খাবারের জোগান দেয়, কেউ ঘরবাড়ি গড়ে দেয়, কেউ ফুলে ফুলে সাজিয়ে রাখে চারদিক, লালির কি কোনও গুণই নেই, যার জন্য কেউ তাকে ভালবাসতে পারে? সবার নজরের একেবারে দূরে সারাজীবন একা একা বাঁচতে হবে লালিকে?

লালি ভাবে আর দিন যায়। দিন যায় আর লালি ভাবে।

দেখতে দেখতে সূর্যাইয়ের পথ ঘুরল, পাহাড়চুড়োর বরফ গলতে লাগল। ধীরে ধীরে বসন্ত এসে সবুজ রং মাখিয়ে দিল চারদিকে। হাওয়া ঝেড়ে দিল সব ধুলো কুটো, মেঘেরা জল পাঠিয়ে গাছের পাতা চকচকে করে দিল। লালিগুরাসের শরীরেও আশ্চর্য পরিবর্তন এলো, প্রথমে কুঁড়ি তারপর ফুল। আর সে এমন ফুল, দেখে চোখ ফেরানো যায় না।

ওদিকে উতিশ কুমারের বয়স বেড়ে গেলেও দেমাকের জন্যই তার জীবন সঙ্গী জুটল না। একদিন একঝাঁক প্রজাপতি উতিশের কানে কানে লালিগুরাসের রূপের কথা বলতে বলতে উড়ে গেল। উতিশ চমকে উঠে তখনই রওনা দিল লালির পাড়ায়, কথাটা সত্যি কিনা যাচাই করতে।

গিয়ে দেখে, যা শুনেছে তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী হয়ে উঠেছে লালিগুরাস। উতিশ তার কাছে গিয়ে বলল, চিনতে পারছ? আমি সেই উতিশ কুমার যাকে তুমি বিয়ে করতে চেয়েছিলে। চল আমরা বিয়ে করি।

লালির সন্মানজ্ঞান টনটনে। সে আর উতিশের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে রাজি হল না। উতিশের ভারি অনুতাপ হল। লজ্জা ঢাকতে সে পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করল।

সেই থেকে পাহাড়ের ঢালে জন্মায় উতিশ। পাহাড়ে ধস নামলে উতিশের প্রাণ যায়, আর লালিগুরাস একলাই থাকে পাহাড় চুড়োয়।

সুচন্দ্রা ভট্টাচার্য

কবির কলমে

পরিচয়ের ভুগোলের বাইরে যা কিছু

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

এসে দাঁড়ালাম একপক্ষকাল পর ভাড়া বাড়ির দরজায়। লাল কিংবা ডিপ খয়েরি কালারের উপর মাকড়সার জালগুলো নকশা বানিয়েছে। মধ্যে মধ্যে নিশ্চিন্ত পাকানো গুটি। কেমন ভয়ঙ্কর ব্যাপার স্যাপার। শরীর ছুঁলেই ইচিং। এই ইচিং, দংশন, বিভিন্ন প্রাণীজ দাগ কম এলো না এ শরীরে। তাই এই পোকামাকড় থেকে দূরে থাকতেই চাই, ওই ঘাড়ে এসে পড়া যাকে বলে,অনিচ্ছুককে একটু উসকে দেওয়া। আর বুকের ভেতর অস্বস্তি বাড়ানো। পাশের ফ্ল্যাট, মুখোমুখি ফ্ল্যাট সবেতেই এ্যায়সান বড় বড় তালা ঝুলছে। যথারীতি সন্ধে পেরিয়ে রাত হয়েছে স্কুল থেকে ফিরতে। খুব সহজে হাঁটা পথে নানা স্মৃতি ভাঁজতে ভাঁজতে সাগরদীঘির পাশ দিয়ে শহীদবাগ পেরিয়ে আমতলার শিবকে অভ্যাস বশে প্রণাম ঠুকে বকুলতলার মোড়ে আমার ছ বছরের সঙ্গী ফ্ল্যাটটার দিকে এগিয়ে যেতেই ওটাকে কেমন ভূতুড়ে কুঠুরি মনে হয়। ম্যাজমেজে শরীরে জানি আর ইচ্ছেই করবে না কোলাপসিবলগেট সরিয়ে সরু নিতান্ত সংকীর্ণ সিঁড়ি ভেঙে আবার রাস্তায় নামতে। কী খাব তার ঠিক নেই। ফ্ল্যাটের হা হা করা বড় দুটো ঘর, পেল্লায় সাইজ রান্নাঘর, ধুলো ভরা বারান্দা আর বিলিয়ার্ড কোর্টের মাপে বেশ বড় একখানা বাথরুম আমাকে সর্বক্ষণ ভেংচি কাটে। নিজভূমে পরদেশীকে বিদ্রূপ করে বোধহয়। আমিও সেসব কাহিনী মাথায় নিয়েই গুন গুন গেয়ে উঠি মাঝে মধ্যে। বিছানো ফরাসে সংগীত রেওয়াজের অনুকূল স্থান। দু-একদিন হারমোনিয়াম তানপুরায় হাত লাগিয়েও দেখেছি ইচ্ছেটা মরে যাচ্ছে। কেমন'সংসারে মন দিয়েছিনু'ভঙ্গী। আসলে এসব ঘটে যায় কর্মক্ষেত্র থেকে দূরে পরিচিত মুখের আশপাশে বেশিদিন কাটালে। এসব ফিরতে ইচ্ছে না করার দিক। আর উটকো অসুখ টসুখ বাঁধিয়ে বাড়ির লোকেদের, সান্নিধ্য, ছাদের রোদ্দুর, গাছপালার হাওয়া গায়ে লাগিয়ে সদ্য তরতাজা হয়ে উঠতে না উঠতেই আবার ফেরার ঘন্টা বাজে। মন আর ইচ্ছেটা বড় বেয়ারা টাইপ। যখন তখন এদিক ওদিক ডানা মেলে। অক্ষর তৈরির জন্য সাদা পৃষ্ঠা উন্মুখ হলেও দাগ পড়ে না। তখনই মন চলে যায় উদাস বাগানের কাছাকাছি। ডিপ্রেশন নাম নিয়ে, কিংবা বিশ্রাম বলা যেতে পারে। আসলে লেখক কবি অনেকেই যেমন প্রকৃতির বহু কিছু আঁকড়ে উপজীব্য করে সারাজীবন কাটিয়ে দিতে পারেন, সব কিছুকে সজীব সত্তা আশপাশে হেঁটে বেড়ানো জীব মনে করলেই হল। তারাই তখন চরিত্র এক একজন। রবীন্দ্র জীবনে বসন্তের প্রাদুর্ভাবেই শুধু না, সব ঋতুতেই কথা বলে উঠেছে পাতা, আম্রমুকুল, মঞ্জরী, মাধবীলতাকে নয়! তেমনি নবনীতাদি পড়তে পড়তে দেখেছি জীবন জুড়ে গাছেদের ভূমিকা। ঠিক তখনই সাহসে ভর করে ছোটবেলার দুটো নারকেল গাছকে বর বউ পাতিয়ে খেলে যাওয়া মনটাকে স্থায়ী করে নিই। সেই চারটে উঠোন নাচতে থাকে চোখের উপর। বাগানের স্থলপদ্মের গাছে দোয়েল কিংবা বুলবুলির বাড়িঘর ফিরে আসে। ওদের ছানাদের শিকার করে নেওয়া গুঁফো বেড়ালকে দুচোখে দেখতে না পারা থেকে যায়। জীবন জুড়ে খরখরে শরীরের একটা প্রাচীন কাঠগোলাপ গাছ আর একরাশ হলুদ বুকের সাদা ফুল, একখানা ডালিম গাছ, বিরাট সবুজ লাল পাতার জলপাই আর ঝাঁকড়া কুটরাজ ফুলের 'এ কী এ সুন্দর শোভা' দেখতে দেখতে বড় হয়ে ওঠা এক মেয়ে মনের মধ্যে স্পষ্ট ছবি হয়ে বসে যাওয়া পোক্ত করে নেয়। চরিত্রগুলো ছবির মত চলচ্চিত্রের মত আলো বয়ে আনে। আর ওদের কথা বলতে ইচ্ছে করে বার বার।

আবার ফিরি রাত ঘনঘোর হয়ে থাকা আমার তোর্সার ধারের রেলিং বারান্দায়। অন্ধকার অনুভব করি। হয়ে ওঠা চওড়া পিচঢালা রাস্তায় অহরহ ট্রাফিকের আওয়াজ। হেডলাইটের জোরালো আলো আর হঠাৎ প্রাণ চলে যাওয়া নির্বিঘ্ন নিশ্চিন্ত নেড়ি কুকুরের যন্ত্রণা দেখি। চোখ দুটো এখনো সজল হয় ওর বাচ্চাদুটোর কাতর চিৎকারে।

বাতাসে বারুদ গন্ধেরা দূর থেকে এ কোমল ভাবনাগুলোকে বড় ক্লিশে বলে মনে করতে পারেন, করুন। কিন্তু রাজনীতি সমাজনীতির ভিড় ভিড় মানসিকতার বাইরে তো কোন মানুষই যেতে পারেন না। তারা থাক প্রচ্ছন্ন। যেমন কর্মক্ষেত্রে চৌহদ্দির ভিতর গাছেদের দুলুনি রোদের আনাগোনা, শিশুবয়সের তুলে আনা এক্কাদোক্কা, কিত কিত খেলার বাঁধানো রাস্তা ঠিক তেমনি থাকলেও মানুষটির যে বয়স বেড়ে তাল গাছ ছুঁয়েছে সেকথা মন না মানলেও পারিপার্শ্বিক জানিয়ে দেয় বার বার। ভিতর থেকেই কে যেন বলে ওটা করতে নেই, সেটা করতে নেই। তবে এ মানুষ বড় এক বগগা। জেদি। ইচ্ছেটি হল তো ওর বশে বহু কিছু করে ফেলার জন্য আকু পাঁকু। এই যে খাঁ খাঁ ফ্ল্যাটে নিবু নিবু বারান্দার আলো পেরিয়ে ঘরের ভিতর একলা বসেও নীচতলা থেকে উঠে আসা নির্জন ঘুমের শ্বাস প্রশ্বাস শব্দেরা খুব স্পষ্ট। রাত বারোটা পেরোলেই সে শব্দ উথাল পাথাল ঢেউ। কানের ভিতর ঢুকে মরমে যখন প্রবেশ করছে ঠিক তখনই আমি পুরবী কিংবা ইমনকল্যাণে সুর ধরি। একার ঘরে সে সুর প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসে। এ ঘরের ফরাসে সামনে খোলা হারমোনিয়ামের সামনে থেকে অন্য ঘরের আয়নায় আমার সংগীত সাধার প্রতিবিম্ব দেখি। মনে মনে খুশি হই এই ভাবনায় যে আশপাশের তালাবন্ধ ঘর থেকে প্রতিবাদ করবে না কেউ মাঝরাতের মুখ ব্যাদান কিংবা সুর না অসুর বিচার করে। এক বছর আগেও আমার পাশের ঘরে এক ভদ্রলোক থাকতেন আর আমি খুব সংকোচে সংগীত ঝাঁপি খুলতাম। একদিন ভীষণ খুশি হয়ে গেলাম, উনি দরজায় তালা লাগিয়ে অফিসে বের হতে হতে আমাকে সামনে দেখে বললেন, বাঃ কী অপূর্ব গান...শুনছি প্রতিদিন। ইত্যাদি ইত্যাদি। আহা! মনে সাহস বেড়ে গেল। প্রায় প্রতিদিন চর্চা করতে লাগলাম।.এখন ইচ্ছেগুলো ওড়াউড়ি করছে। সেই ভদ্রলোক রিটায়ার করেছেন। বাড়ি ফিরে জুড়িয়েছে আর কি! বদলে নব দম্পতি এসেছে। প্রায়দিনই তাদের ঘর তালাবন্ধই থাকে। এ দোতলা সম্পূর্ণ একার এখন। বারান্দা পেরোনো ঘরেও দু-চারখানা তালা ঝোলে।

রাতের অন্ধকারে কোলাপসিবল পেরিয়ে রাস্তায় নামি। হাঁটতে থাকি আধো আলো আধো অন্ধকারের ভিতর দিয়ে সাগরদীঘির বাঁধানো রাস্তার চারধারে। একবার পুরো ঘুরলেই এক কিলোমিটার। আর দু-তিনবার ঘুরে কাচারি মোড়ের উজ্জ্বল আলোয় রুটির দোকানের উত্তাপ নিতে নিতে রুটির গন্ধ আর ওমে ফুলকো বাতাস ফুস করে বেরিয়ে যেতে থাকে। উঠে আসে আমার হাতের কাগজের গরম প্যাকেটে। তরকারির গন্ধে মাখামাখি হতে হতে আটার সুবাসে হাঁটতে থাকি আবার সাগরদীঘির জলের ধারে...সে রাতগুলো হয়ে যায় অন্যরকম। কেউ যেন বলে, এইতো বাঁচা। জীবনধারণ। কতজনের বাড়ানো হাত যে লেগে থাকে এ বাঁচায়, রুটিঅলা থেকে স্কুলঅলা...অফিসঅলা থেকে বাড়িঅলা পর্যন্ত।

আবার ফিরি রাত ঘনঘোর হয়ে থাকা আমার তোর্সার ধারের রেলিং বারান্দায়। অন্ধকার অনুভব করি। হয়ে ওঠা চওড়া পিচঢালা রাস্তায় অহরহ ট্রাফিকের আওয়াজ। হেডলাইটের জোরালো আলো আর হঠাৎ প্রাণ চলে যাওয়া নির্বিঘ্ন নিশ্চিন্ত নেড়ি কুকুরের যন্ত্রণা দেখি। চোখ দুটো এখনো সজল হয় ওর বাচ্চাদুটোর কাতর চিৎকারে। অথবা অসহ্য ঠাণ্ডায় কুয়াশার আস্তরণ ভেদ করে গভীর রাতে ক্ষিপ্র চিতার ঝাঁপ দেওয়া দেখে ফেলি। সশব্দে বন্ধ করি বারান্দার লেপটে থাকা দরজাটা। মনে পড়ে যায় হাড় হিম হয়ে যাওয়া ঠান্ডা রাতের চিতার আক্রমণে আমার বন্ধুর মামার হারিয়ে যাওয়ার সে বাস্তব ছবি, সেতো সেই আশির দশকে। জলজ্যান্ত এক মানুষকে কুয়োতলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে কুড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল মরণের ঘরে। সকালে সেই কুয়াশার আস্তরণভেদী বন্য শ্বাপদের গল্প ওরা কেউ বিশ্বাস করবে না জানি। পর পর নির্বাক আস্তরণ পড়বে আমার ভাবনায়।

সে রাতে আর গান হবে না। এঘর ওঘর বিস্তর পায়চারি চলবে। খেতে ইচ্ছে করবে না আর। রাত নটা কিংবা সাড়ে নটায় নিয়ে আসা রুটি রাত বারোটায় কীরকম লাগতে পারে! সঙ্গে বিস্বাদ তরকারি ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া। এমন হয় না সবদিন। তখন পিছন ফিরে তাকাতে ভাল লাগে। গড়গড়িয়ে চলা। বুকের ভেতর থেকে লাফিয়ে নামে ছোট্টবেলা তিরতিরে নদী। সারা দুপুরের নির্জন প্লাবনে এ বাড়ি পেরিয়ে ও বাড়ির বুড়ি, ইতানের খোঁজে পা বাড়ানো। ওদের কখনো ভাবি নি অন্য কেউ, অনাত্মীয়। কাঠগোলাপের ডালে দোলনা বেঁধে খেলার মিতালি, অর্জুন গাছটা যেমন হয়ে উঠেছিল বাড়ির বৃহত্তম বুড়োটে পাহারাদার। তারই নীচে মঞ্চ বেঁধে নাটক। সার্থক চলন। সে বয়সেই বন্ধুদের নিয়ে পাকামির নির্দেশনা অভিনয়। অনুবাদ নাটক। লালদোলাই। মুখ্য ভূমিকাটিও পরিচালকেরই। সে সব কখন যে জীবন থেকে চলে গেল! কখন সে বুড়োটে বড়সড় পাহারাদারকে কেটে ফেলা হল। দাঁড়িয়ে পড়ল ইমারত। কাঠগোলাপটাও যেদিন চলে গেল সেদিন সত্যিই বন্ধু হারিয়ে ফেলেছি।

তবুতো ফিরতে হল রাজনগর। বন্ধুহীনের অপরিচয়ের অন্যভূমি। যেখানে নতুন করে নতুন পরিচয়ের বাঁধন এঁটেছি এখন। কখনো ধুলোর ঝড় এসে ডুবিয়ে দেয় ঘরের ভিতর কখনো লাল ইটের খিলানে, নয়তো বকুলতলার দোতলার হা হা শূন্যতার ফ্ল্যাটবাড়ির যাবতীয় আসবাব, বইপত্রের ভিতর একলাই শুনি আমার দীর্ঘশ্বাস। কখনো তা আশার হাতছানি, কখনো যাবতীয় বিষাদের ঘরবাড়ি। এভাবেই তো দিনগুলো পেরিয়ে যায় বাতাসের আগে। চুপকথার ধারে আমার বাড়ির দরজায় কখন এসে দাঁড়ায় ধ্রুব, আইভি, প্রদোষদা, সঞ্জয়দা, মাধবী, বঙ্গজ কিংবা মানস, উঠে বসি আবার। শৌভিকের আগ্রহে আবার ফিরে পড়তে বসি রম্যাণী বীক্ষ্য। তার হলদে হয়ে যাওয়া অদ্ভুত গন্ধের পাতাগুলো তবুও অনেকটা অধরাই থেকে যায়। আবার শুরু করি প্রথম থেকে ফিরে দেখার গল্পগুলো।

মাথার ভিতর একটি লাইনই ঘোরে ফেরে। আমাদের কোনো ভৌগোলিক অবস্থান নেই। নিজের লেখা অমীমাংসিত কবিতার লাইনগুলি জীবনে সত্য করে তুলি কখনো ডুয়ার্স... জলপাইগুড়ির আমার ভালবাসার অতি পরিচিতির ঘ্রাণ নেওয়া রাস্তাগুলো, মানুষেরা, আজীবন বদলে যাওয়া যার স্বভাব, সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। সবটুকু ভালমন্দ নিয়ে জলপাইগুড়ির সবটুকু আমার হয়ে উঠেছে কখন যেন। কতযুগ পেরিয়েছে হিসেব করি না এখন। সেই ঘুমে জাগরণে স্বপ্নে দেখা রাজনগরে পা দিয়েই আমূল বদলে যাওয়া স্বার্থের ছবি দেখেছি। মানুষ, সাংস্কৃতিকতা,সাহিত্যজগৎ অনেকটাই অন্যরকম। মনের সঙ্গে না মিললেও এ মাটি তো আমার ।সিংহভাগ সময় জীবনের গড়ে ওঠার কাল কত কিছু যে দিয়েছে শিখিয়েছে, মানুষ চিনিয়ে নিয়েছে ঘাড়ে ধরে।পরিস্থিতি, পরিবেশে যুঝতে শিখিয়েছে। তাই এ বঙ্গ ও বঙ্গ নয় সবটুকু মাটির আস্বাদ, বাতাসের ঝোরো উদ্দামতা, বসন্তের গুড়ো রেণু সবই টেনে রাখে। গুণ গুণ করি শব্দ অক্ষরে। পৃষ্ঠায়, কলমে কিংবা কখনো মেইল পেজে, হ্যান্ডসেটে প্রকৃতির যাবতীয় আর কতগুলো ভালবাসার চোখ বাঁচতে বলে নতুন করে।

পুরাণের নারী

কেশিনীর কথা

শাঁওলি দে

যতবার মহাভারত পড়া হয় ততবার ছোট থেকে ছোট চরিত্রগুলো চোখের সামনে ফুটে ওঠে। আপাত দৃষ্টিতে সেসব চরিত্রের তেমন গুরুত্ব না থাকলেও এক সুবিশাল মহাকাব্যে তাঁদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না কিছুতেই। কেশিনী তেমনই এক চরিত্র।

মহাভারতে দুবার কেশিনীর কথা উচ্চারিত হয়। প্রথমে বনপর্বে যেখানে নল ও দময়ন্তীর উপাখ্যান আছে সেখানে নল ও দময়ন্তীর মিলনে কেশিনীর ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়। পরে উদযোগ পর্বে বিরোচন ও সুধন্বার কাহিনীতে কেশিনীর স্বয়ম্বরের কথা উল্লেখিত হয়।

বনপর্বে দেখা যায় দময়ন্তীর ছিল কেশিনী নামে এক সুন্দরী দাসী। নল ও দময়ন্তীর পুনর্মিলনের প্রাক্কালে রাজা ঋতুপর্ণ এসেছিলেন বিদর্ভরাজ ভীমকের কন্যা দময়ন্তীর স্বয়ম্বরে। তাঁর সারথি ছিল বাহুকরূপী নল স্বয়ং। রথের আওয়াজ শুনেই দময়ন্তী বুঝে গিয়েছিলেন এই রথ আসলে কে চালাচ্ছে। কিন্তু কোথাও নলকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না তিনি, কারণ বাহুক অশ্বশালায় ঘোড়াদের দেখাশোনায় ব্যস্ত ছিলেন। সেই সময় দময়ন্তী তাঁর দাসী 'কেশিনী'কে ডেকে পাঠান ও খোঁজ নিতে বলেন যে বাহুক আসলে কে! কেশিনী তখন অশ্বশালায় গিয়ে স্বয়ং বাহুককেই রাজা নল সম্পর্কে জানাতে অনুরোধ করেন। নল তখন নিজের পরিচয় গোপন করেই নিজের সব কথা কেশিনীকে জানান ও কেশিনী সেসব দময়ন্তীকে গিয়ে জানালে বাহুকই যে নল সেটা দময়ন্তীর কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। দময়ন্তী বারবার কেশিনীকে বাহুকের কাছে পাঠাতে থাকেন, যাতে নলের আসল পরিচয় বেরিয়ে আসে। অবশেষে কেশিনীর সহায়তায় নল ও দময়ন্তীর মিলন ঘটে।

আবার উদযোগ পর্বে আবার আমরা কেশিনীর নাম পাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ঠিক আগে ধৃতরাষ্ট্র সংকটে পড়েছিলেন। মনে আসছিল নানা রকম দ্বিধা। বিদুর এই সময় নানা রকম পরামর্শ দিয়েছিলেন তাঁকে। সেগুলো ছোট ছোট নীতি গল্পে ধরা পড়েছে। সরল ব্যবহারের যে কোনও বিকল্প হয় না সেই কথা বোঝাতে গিয়ে বিদুর একটি সুন্দর গল্প বলেন ধৃতরাষ্ট্রকে।

দাসী হলেও কেশিনী একজন সৎ-বংশের রমণী ছিলেন। বিবাহযোগ্যা হলে তাঁর পিতা স্বয়ংস্বরের আয়োজন করেছিলেন। কেশিনীর রূপে মুগ্ধ হয়ে সেই সভায় উপস্থিত হন প্রহ্লাদ পুত্র বিরোচন। তিনি এসেই কেশিনীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তখন কেশিনী তাঁকে প্রশ্ন করে, কে শ্রেষ্ঠ? ব্রাহ্মণ না দৈত্য? বিরোচন তখন সগর্বে জানান প্রজাপতি কাশ্যপের বংশের দৈত্যরাই শ্রেষ্ঠ। এবিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকার তো কথা নয়! কেশিনী উত্তর শুনে জানালেন পরদিন ব্রাহ্মণ সুধন্বা এলে তখন তাঁর উত্তর শুনে তিনি স্থির করবেন যে কার গলায় মালা দেবেন।

পরদিন সুধন্বা এলে কেশিনী তাঁকে পাদ্য অর্ঘ্য ও আসন দিলে বিরোচন সুধন্বাকে তাঁর হিরন্ময় আসনে বসতে বললেন। কিন্তু সুধন্বা বললেন যে তিনি বিরোচনের আসন স্পর্শ করলেন। তাঁর সঙ্গে একই আসনে বসা সুধন্বার পক্ষে সম্ভব নয়।

বিরোচন ক্ষুব্ধ হলেন। বললেন, সুধন্বার জন্য কাষ্ঠাসন তক্তা, চর্মাসন কিম্বা কুশাসনই উপযুক্ত।

সুধন্বা হাসিমুখে জানালেন, পিতা পুত্র, দুই ব্রাহ্মণ, দুই বৈশ্য, দুই শূদ্র এক আসনে বসতে পারেন, কিন্তু ভিন্ন জাতির দুইজন মানুষ কখনও তা পারে না। এমনকি বিরোচনের পিতাও কখনও সুধন্বার সঙ্গে একই আসনে বসেন না, সবসময় নিচে বসেন। বিরোচনের বয়স কম, তাই না বুঝেই এত কথা সে বলছে।

বিরোচন তখন সোনাদানা, গরু, ঘোড়া এসব পণ রেখে বসলে সুধন্বা বলেন এমন পণ না রেখে জীবন পণ রাখা উচিৎ।

এরপর দুজনে প্রহ্লাদের কাছে উপস্থিত হলে প্রহ্লাদ অবাক হন এবং সুধন্বাকে সম্মানিত করার আয়োজন করেন। কিন্তু সুধন্বা সেসব থামিয়ে জিজ্ঞেস করেন, কে শ্রেষ্ঠ? ব্রাহ্মণ না দৈত্য? এই প্রশ্নের জন্য তাঁদের যে জীবনও বাজি রাখা হয়েছে সেকথা জানাতেও ভোলেন না তিনি।

প্রহ্লাদ তখন উত্তর দেন সুধন্বার পিতা অঙ্গিরা প্রহ্লাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সুধন্বার মাতাও বিরোচনের মাতার চাইতে শ্রেষ্ঠ। বিরোচন ভুল, সুধন্বাই ঠিক। বাজী অনুসারে বিরোচনের প্রাণ নেওয়ার কথা, কিন্তু প্রহ্লাদ ছেলের প্রাণ ভিক্ষা চান সুধন্বার কাছে।

পুত্রের প্রাণরক্ষার জন্য প্রহ্লাদ যে মিথ্যের আশ্রয় নেয় নি এটা মনে করে সুধন্বা খুব খুশি হন এবং বিরোচনকে মুক্তি দিয়ে দেন। তবে শুধু শর্ত দেন কেশিনীর সামনে বিরোচন সুধন্বার পা ধুইয়ে দেবে। এরপর কেশিনী মনের আনন্দে সুধন্বার গলায় মালা দেন।

এইভাবেই কেশিনীর কথা মহাভারতের দুই পর্বে লেখা আছে। যদিও ব্যাসদেব বেশি শব্দ খরচ করেন নি কেশিনীকে নিয়ে, তবু মহাকাব্যের দুটি বড় ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে রেখে কেশিনী চরিত্রটিকে এক সুন্দর রূপ দিয়েছেন। মহাভারতে কেশিনীর চরিত্র অসম্পূর্ণ। পরবর্তী জীবনে ওঁর কী হয় তাও জানা যায় না। তবু পুরানের নারীদের নিয়ে আলোচনায় কেশিনীর নাম একবার না একবার উচ্চারিত হওয়া কি একেবারেই উচিৎ নয়?

রাসায়নিক রস

নারী বিষয়ক আলোচনা সভার শেষদিকে যা ঘটেছিল

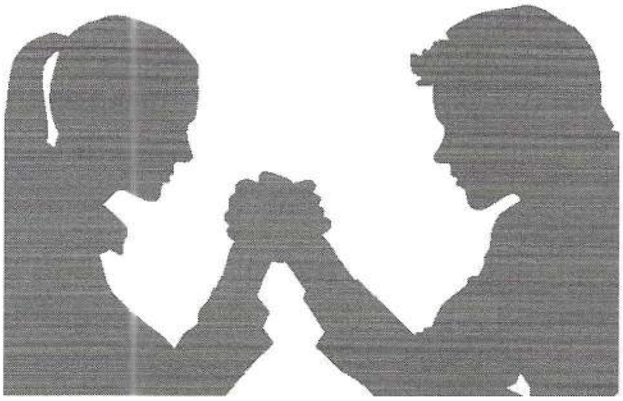

ঘোষক: এতক্ষণ আপনারা 'নারীরাই কি পুরুষ' বিষয়ক আলোচনা শুনছিলেন। এবার ইন্টারাক্শন্ সেশান। আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন। বক্তারা জবাব দেবেন।

শূর্পনখা: বক্তাদের এইট্টি টু পার্সেন্ট পুংলিঙ্গ। নারীরা কী আর কী নয় তা কি অপগন্ডো ছেলেগুলো ঠিক করে দেবে নাকি র‍্যা?

স্বামী ভাবনানন্দ: এই যে! আপনার কেউ কিছু এর উত্তরে বলবেন?

সাধ্বী শকুন্তলা: আমি বলছি! এই যে শুনুন, শাস্ত্রে বলেছে পতির পূণ্যে সতীর পূণ্য নইলে খরচ বাড়ে!

বেহুলা: দেব ঝাঁটার বাড়ি! এটা রবিবাবুর রচনা।

সাধ্বী শকুন্তলা: রবিবাবু কে? উনি কি ইন্দ্রদেবের কথা বলছেন?

স্বামী ভাবনানন্দ: আরে সেই যে লোকটা বেতাল পঞ্চবিংশতির অনুবাদ করেছিল।

পরকীয় বোস: দেখুন, পুরুষরা যত বেশি নারী নিয়ে বলবে ততই বৈষম্য ঘুচে যাবে। মার্কস বলেছিলেন—।

হিড়িম্বা: থামুন থামুন! নারী বিষয়ে মার্কস কিস্যু জানতেন না। সুতরাং আপনি চেপে যান!

খাইবার মোল্লা: ইসলাম এ ব্যাপারে কী বলেছে তা কিন্তু আমি বলেছি।

মুক্তা খাতুন: দেখেছেন হিড়িম্বাদি! নিজের কথা ইসলামের নামে চালিয়ে আবার কেতা নিচ্ছে!

স্বামী ভাবনানন্দ: মায়েরা, বোনেরা আপনারা শান্ত হয়ে বসুন। আমরা চাই আপনারা সবাই সীতা-সাবিত্রী হয়ে উঠুন। আরে এ কী! পাদুকা নিক্ষেপ করছেন কেন?

সাধ্বী শকুন্তলা: এই জন্যই শাস্ত্রে বলেছে নারীর পাদুকা ধারণ নিষিদ্ধ।

রাসসুন্দরী দাসী: দেখুন ভাই! আরো বেশি পাদুকাক্রান্ত হওয়ার আগে বলুন নারী নির্যাতন কবে কমবে?

অধ্যাপক রতি রে: নির্যাতন? আচ্ছা, পুরুষ কি নির্যাতিত হয় না?

সাধ্বী শকুন্তলা: আমার বর-ই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ!

মনসা: মলো যা! এরপর বলবি মেয়েরা রেপ করে পুড়িয়ে দেয়।

খাইবার মোল্লা: সে তো পাশচাত্ত্য সংস্কৃতির জন্য হচ্ছে। এমন সব পোশাক পরে!

স্বামী ভাবনানন্দ: ঠিক বলেছেন মোল্লা সাহেব! সব মেয়ে তো আমাদের মা।

সরস্বতী: ওমা! স-ব মেয়ে আপনার মা?

স্বামী ভাবনানন্দ: হ্যাঁ। এতে বিস্ময়ের কী আছে?

লক্ষ্মী: দিদি বলতে চাইছেন যে তবে সব মেয়ে আপনার বাবার বউ?

পুষ্পরেণু মুখার্জি: আপনারা মূল বিষয় থেকে সরে যাচ্ছেন! আমরা তো মঞ্চে প্রমাণ করেছি ছেলে আর মেয়ে বিভাজন অনুচিত। আমরা তো চাই মেয়েরা ঘর থেকে বেরিয়ে কাজে নামুক! কিন্তু তাঁদের এমন পোশাক পরা উচিত নয় যা ভারতীয় সংস্কৃতির বিরোধি।

কাত্যায়নী: তবে তো বাছা আমাদের উর্দ্ধাঙ্গ খোলা রেখে বেরুতে হয়।

ধনশ্রী মহারাজ: সত্যযুগে ধর্ষণ হত না। তখন এটা সম্ভব ছিল।

সরস্বতী: তার মানে কলিযুগে পুরুষরা বদলে গেছে। নিজেদের বদলে ফেলুন আবার! ঝামেলা শেষ।

সাধ্বী শকুন্তলা: এই যে! আপনি কি বামপন্থী? যাদবপুর না জেএনিউ?

দুর্গা: মরণ! সরস্বতীকে চিনতে পারছ না?

শূর্পনখা: সেটাই স্বাভাবিক দুর্গাদি।

গুরু বালকদাস: সভাপতি হিসেবে এবার আমি কিছু বলতে চাই।

মনসা: দয়া করে এটা বলুন যে মেয়েরা মানুষ কি না?

গুরু বালকদাস: সবাই ভগবানের সন্তান। কেউ নারী, কেউ পুরুষ। ভগবান যেমন চেয়েছেন তেমনই হবে।

হিড়িম্বা: ভগবান কি চাইছেন যে মেয়েরা নির্যাতিত হোক?

গুরু বালকদাস: না। মেয়েরাই আসলে মেয়েদের শত্রু।

চন্দ্রবুড়ি: তোর বাবার মাথা!

সাধ্বী শকুন্তলা: মাইন্ড ইওর ল্যাঙ্গোয়েজ!

মহামায়া: সংস্কৃতে বলুন। ইংরিজি বুঝি না।

খাইবার মোল্লা: মহান কোরানে লেখা আছে অঙ্গপ্রদর্শনকারী নারীরা সপ্তম দোজখে ভয়ানক শাস্তি ভোগ করে।

স্বামী ভাবনানন্দ: আমাদের বেদ-গীতাতেও লেখা আছে। আপনারা সেটাই কপি করেছেন।

খাইবার মোল্লা: না মুমকিন! আমরা সেমেটিক।

গুরু বালকদাস: নিজেদের মধ্যে বিভেদ করছেন কেন? পরধর্মের নারীকে ধর্ষণ করলে কোনও পাপ হয় না।

স্বামী ভাবনানন্দ: আরে! এ কী! দর্শকাসনে একটা আলোর গোলক কোত্থেকে এল?

মেহেরুন্নেসা: ওটা আমাদের সম্মিলিত তেজপুঞ্জ রে মূর্খ!

পুষ্পরেণু মুখার্জি: দয়া করে এক ধর্মের দর্শক অন্য ধর্মের আলোচকের নিন্দা করবেন না!

স্বাধী শকুন্তলা: থামুন তো! গোলকালোক যেন মঞ্চের দিকেই ধেয়ে আসছে। কী হলো! আপনারা পুংলিঙ্গরা কিছু করুন! আপনারাই তো মঞ্চে সংখ্যা গরিষ্ঠ!

গুরু বালকদাস: চুলোয় যাক লিঙ্গ! য পলায়তি সঃ জীবতি!

(গোলকালোক মঞ্চে আছড়ে পড়তেই প্রবল এক নিঃশব্দ বিস্ফোরণ। হৈ-হট্টগোল। দর্শকাসন থেকে শূর্পনখা লাফ দিয়ে স্বামী ভাবনানন্দকে চেপে ধরে বলল, 'তোকে আমার রেপ করতে ইচ্ছে করছে রে পাগলা!' কিন্তু মহামায় তাঁকে নিরস্ত করলেন)

শূর্পনখা: আপনি বাধা না দিলে ছেলেগুলোকে একটু নির্যাতন করতাম দিদি!

মহামায়া: ছেড়ে দে! আমরা তো জন্ম দিই, তাই না?

অনু ঘটক

EKHON DUARS, Vol-6, Issue-12 WBBEN/2014/56733 Rs. 20 only

ডুয়ার্সের বইপত্র। রংরুটের বইপত্র। ছোটদের বইপত্র

ডুয়ার্স বেস্ট সেলার

তিস্তা - উৎস থেকে মোহনা। অভিজিৎ দাশ। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি। দেবপ্রসাদ রায়। ১৫০ টাকা ***
চায়ের ডুয়ার্স কী চায়? গৌতম চক্রবর্তী ১১০ টাকা
ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে? সৌমেন নাগ। ১৫০ টাকা ***
আলিপুরদুয়ার। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২৫০ টাকা
কোচবিহার ২য় সংস্করণ। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২৫০ টাকা
জলপাইগুড়ি। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ৩০০ টাকা
এখন ডুয়ার্স সাহিত্য ২০২০। শুভ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ১৯৫ টাকা
গণ আন্দোলনে কোচবিহার। হরিপদ রায়। ২৪০ টাকা
রাণী নিরুপমা দেবীর নির্বাচিত রচনা। দেবায়ন চৌধুরী। ১৬০ টাকা
শ্রম ও জীবিকার উত্তরপক্ষ। প্রশান্ত নাথ চৌধুরী। ১৬০ টাকা
কথায় কথায় জলপাইগুড়ি। রণজিৎ কুমার মিত্র। ২০০ টাকা
আদিবাসী অসুর সমাজ ও সংস্কৃতি। প্রমোদ নাথ। ১৬০ টাকা

ডুয়ার্সের গল্প সংকলন

ডুয়ার্সের গপ্পোসপ্পো। সাগরিকা রায়। ১৫০ টাকা
চারপাশের গল্প। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১০০ টাকা ***
লাল ডায়েরি। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা ***
সব গল্পই প্রেমের নয়। হিমি মিত্র রায়। ১৬০ টাকা
দিল সে দিল্লী সে। কল্যাণ গোস্বামী। ২৯৫ টাকা

ডুয়ার্সের পেপারব্যাক সিরিজ

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস। সংকলন। ১৯৫ টাকা
তরাই উৎরাই। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৬৫ টাকা
লাল চন্দন নীল ছবি। অরণ্য মিত্র। ১১০ টাকা
শালবনে রক্তের দাগ। ১২৫ টাকা
অন্ধকারে মৃত্যু-আলিঙ্গন। বিপুল দাস। ৫৫ টাকা
মেঘের পর রোদ। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ৫৫ টাকা
কুহুলিয়াদের দেশে। সুকান্ত গাঙ্গুলী। ৫৫ টাকা

ডুয়ার্সের কাব্য চর্চা

পঞ্চাশ পর্যটন শেষে মাধুকরী ধান। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্সের হাজার কবিতা। অমিত কুমার দে সম্পাদিত। ৫০০ টাকা
বোধিবৃক্ষ ছুঁয়ে এক চির ভিক্ষুক। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা

বিষয় পর্যটন

আমাদের পাখি।
তাপস দাশ ও উজ্জ্বল ঘোষ। ৪৯৫ টাকা
সিকিম। সংকলন। ২০০ টাকা ***
নর্থ ইস্ট নট আউট। গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা
রংরুটে হিমালয় দর্শন। সংকলন। ২০০ টাকা ***
উত্তরবঙ্গের হিমালয়ে। প্রদোষ রঞ্জন সাহা। ২০০ টাকা ***
সব্যসাচীর সঙ্গে জলে জঙ্গলে। সংকলন। ১৫০ টাকা ***
মধ্যপ্রদেশের গড় জঙ্গল দেউলে।
সুভদ্রা উর্মিলা মজুমদার। ২০০ টাকা ***
সুন্দরবন অনধিকার চর্চা।
জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী। ১৫০ টাকা ***

প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন। তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস। ১১০ টাকা
জয় জল্পেশ। শুভ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ৯০ টাকা

অরণ্য কথা বলে।
শুভ্রকান্তি সিনহা। ১৫০ টাকা ***
সে আমাদের বাংলাদেশ।
গৌতম কুমার দাস। ২০০ টাকা
পাসপোর্ট প্রতিবেশিদের পাড়ায়।
দীপিকা ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা ***
তিন মহাদেশ দশ দিগন্ত।
শান্তনু মাইতি। ১৭৫ টাকা
মুর্শিদাবাদ। জাহির রায়হান। ১৯৫ টাকা
বাংলার উত্তরে টই টই। দ্বিতীয় সংস্করণ।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ১৯৫ টাকা

বিষয় নাটক

নাট্য চতুষ্টয়। রবীশ্বর ভট্টাচার্য। ১৬০ টাকা
নির্বাচিত বেতার-শ্রুতি নাট্যগুচ্ছ। সমর চৌধুরী। ২৪৫ টাকা
বাঙ্ময়। সব্যসাচী দত্ত সম্পাদিত। ১২৫ টাকা

শুরু হল ছোটদের সিরিজ

গাছ গাছালির পাঠ পাঁচালি। শ্বেতা সরখেল। ১৯৫ টাকা
ডুয়ার্স ভরা ছন্দ ছড়া। বৈকুণ্ঠ মল্লিক সম্পাদিত। ১৯৫ টাকা

*** প্রায় নিঃশেষিত

এখন ডুয়ার্স

বাড়িতে বসেই অর্ডার দিন আমাদের বই। পেয়েও যাবেন নিজের ঠিকানাতেই।

হোয়াটসঅ্যাপ করুন ৬২৯৭৭৩১১৮৮ নম্বরে

ন্যূনতম ৩০০ টাকার অর্ডার দিতে হবে। ৫০০ টাকা বা তার বেশি অর্ডার দিলে ডিসকাউন্ট মিলবে ২০%।

পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরার কোনও ঠিকানায় ক্যুরিয়ার খরচ লাগবে না।

আমাদের অনলাইন শোরুম **www. dooarsbooks.com**

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.